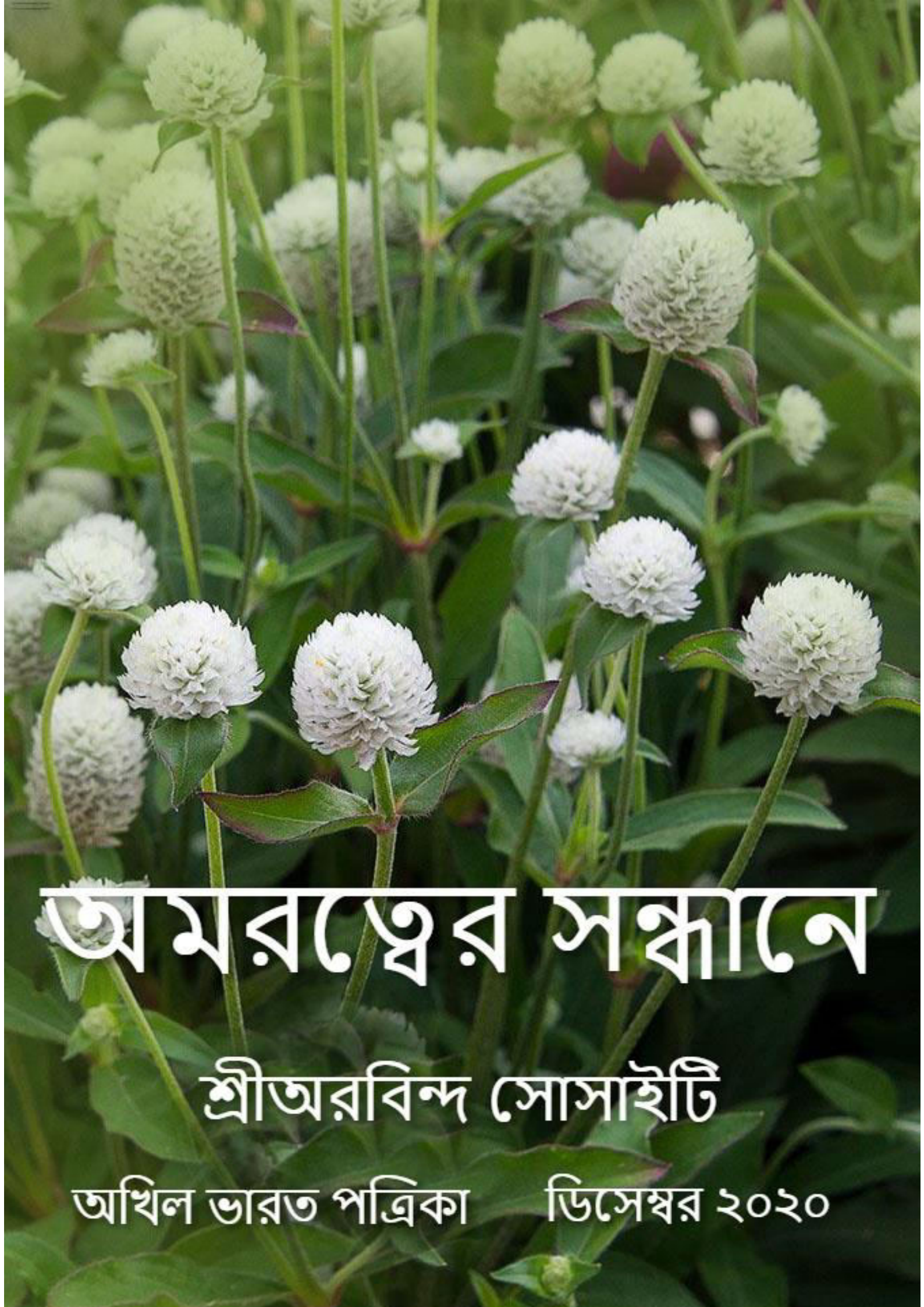

অমরত্বের সন্ধানে

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি

অখিল ভারত পত্রিকা ডিসেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদের ফুল

অমরত্বের সন্ধানে

(শ্রীমায়ের দেওয়া আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য ও ব্যাখ্যা)

এটি একটি প্রতিশ্রুতি!! কখন এটি বাস্তবায়িত হবে?

Botanical Name: Gomphrena globosa

AKHIL BHARAT PATRIKA

A monthly magazine of

SRI AUROBINDO SOCIETY, WEST BENGAL

Editor: GOPAL BHATTACHARJEE

Published & Printed by Sudhendu Saha, on behalf of

Sri Aurobindo Society, West Bengal

8, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700071

Phone: (033) 33513401

e-mail ID: saswestbengal@aurosociety.org

and Printed at:

Pratima Press & Process

3, Bankrai Street, Kolkata – 700012

অমরত্বের সন্ধানে

জড় ব্যক্ত করবে আত্মার স্বরূপ —— শ্রীঅরবিন্দ

সূচিপত্র

মৃত্যুভয় ও তা জয়ের চতুর্বিধ উপায়	৫
অমরত্ব কী	১০
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে অমরত্ব	১৭
এক অমর দিব্য দেহের সম্ভাবনা	২৭

সম্পাদকের কথা:

জীবন-মরণ, মরণ-জীবন —- দুটি কথা মুখে মুখে
মোদের চিন্তা-চেতনারে ছিল পরিব্যাপ্ত করি;
পরস্পরের বিরোধী যে তারা, প্রত্যয় মুখে মুখে;
নবসত্য যে প্রকাশিত আজ গুপ্ত যা ছিল সুদীর্ঘকাল ধরি।
জীবনই সত্য, মরণ শুধুই ছদ্মবেশী জীবন;
জীবন ক্ষণিক মৃত্যু, আবার মরণে নবজীবন।।

মৃত্যুভয়

মৃত্যুর স্বচ্ছন্দ গতি আমাদের এ জীবনে। মধুর মরণ
আমাদের প্রতি শ্বাসে ফেলি যায় ত্বরিত চরণ।
কেন ভয় কর তারে? হেরো তার হাসিভরা মুখ
ধরেছে গোলাপী আভা, লাবণ্যের জ্যোতি সমুৎসুক।
মনোরমা কুমারীটি রত যেন কুসুমচয়নে
বসন্তবর্ষণদীপ্ত মধুসিক্ত কোন উপবনে।
এরে ভয় কর তুমি, যে- তরুণী খুলি দেয় দ্বার
জ্যোতির্লোকের তরে আমাদের মুমুক্ষু আত্মার?
ইহা কি বেদনা সেই বহে যাহা শাখাবৃন্তখানি
তাহার গৌরব যবে হরিয়াছে সুকোমল পাণি?
পুষ্পহীন বৃন্তখানি ছিল যাহা মাধুর্যমণ্ডিত
হতশ্রী হয়েছে এবে — তাই কি ব্যথিত?
অথবা কি ব্যাদান করাল হেরিতেছ উন্মোচিত দ্বারে,
তারি ভয়ে কম্পমান? ভীরু আত্মা কহি আমি তারে।
মৃত্যু শুধু অতীতের বেশ পরিহারি
পরিতে বাসকসজ্জা, চিরন্তনের অভিসারী।

অর্যমা: পৃ ৯ অনুবাদ: অবনী সিংহ

মৃত্যু-ভয় এবং তা জয়ের চতুর্বিধ উপায়

ভয় হোল পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক

... সম্ভবতঃ মানুষের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল ভয়-বহুল বিচিত্র স্বত-বিরোধী যুক্তিহীন অর্থহীন ভয়। আর সবরকমের ভয়ের মধ্যে মৃত্যু ভয় সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং দুরপনেয়। সে শিকড় চালিয়ে দিয়েছে অবচেতনার অতলে, সেখান থেকে তাকে উন্মূলিত করা সহজ নয়। কতকগুলো উপকরণ মী মিলে মিশে করেছে তার ষ্ট সৃষ্টি; সংরক্ষণের স্পৃহা এবং চেতনার ধারা অক্ষুন্ন রাখবার আকাঙ্খা, অজানাকে দেখে ভয় পিছিয়ে আসা, আকস্মিক ও অদৃষ্টপূর্বের সম্মুখে অস্বস্তি, আর বোধহয় এসবের পশ্চাতে জীবকোষের গভীরে লুকানো রয়েছে এই একটি সহজাত বোধ যে মৃত্যু অনিবার্য নয়, কতকগুলি শর্ত পূরণ হলে তাকে জয় করা সম্ভব; যদিও বস্তুতপক্ষে সেই জয়ের পথে ভয়ই হল প্রচণ্ড বাধা। যাকে ভয় করিনা তাকেই শুধু জয় করতে পারি, মৃত্যুকে যে ভয় করে মৃত্যুর কাছে আগেই সে পরাজিত।

কি করে এই ভয়ের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? অনেক উপায় আছে। তবে প্রথমে কয়েকটি মূলকথা জেনে রাখলে আমাদের কাজে লাগবে। সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কথা হল, জীবন-ধারা অখণ্ড ও অবিনশ্বর। আর অগণিত স্থূলরূপেই শুধু ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। মনে এই সত্যটি দৃঢ়ভাবে অটলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে রূপাতীত অথচ রূপাতীত সেই নিত্যপ্রাণের সঙ্গে নিজের চেতনাকে মিলিয়ে এক করে ধরতে। সমস্যা তবু থেকেই যায় কিন্তু এই রকমে সেই অপরিহার্য আভ্যন্তরীণ ভিত্তিটি যেখান থেকে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া চলে। সকল ভয়ের অতীত হবার জন্য আন্তর-সত্তা যথেষ্ট আলোকিত হলেও সেই আবিল, স্বতঃস্ফূর্ত, অযৌক্তিক এবং সাধারণতঃ অচেতন-প্রায় ভয় লুকিয়ে থাকে শারীর-কোষে। এই সব অন্ধকার গহনে তাকে খুঁজে করতে হবে, বশে আনতে হবে, তার উপর ফেলতে হবে, তার উপর ফেলতে হবে চেতনা এবং নিশ্চয়তার আলো।

জীবনের বিনাশ হয় না, বাহ্যরূপই লোপ পায়

জীবনের বিনাশ হয় না ; বাহ্যরূপই লোপ পায়, আর এই বিলুপ্তিকেই স্থূলচেতনা ভয় করে। অথচ বাহ্যরূপ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, সে পরিবর্তনকে মূলতঃ উন্নতির দিকে চলা থেকে বিরত করতে পারে না কিছুই। এই উন্নতিশীল পরিবর্তনই দেখাতে পারে মৃত্যু অনিবার্য নয়। অবশ্য এ কাজ কঠিন এবং তার শর্তাবলী অল্প লোকেই পূরণ

করতে সক্ষম। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ এবং চেতনার অবস্থা অনসারে মৃত্যুভয় জয়ের উপায়েরও পার্থক্য হবে। এই উপায়গুলিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে ; প্রত্যেক ভাগে অবশ্য থাকবে বৈচিত্র ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের উপায় গড়ে নিতে হবে।

যুক্তি দিয়ে ভয়ের বিচার

প্রথম উপায় যুক্তিকে ভর করে। বলতে পারো, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় মৃত্যু হল অনিবার্য জিনিস ; শরীর ধারণ করলেই একদিন না একদিন দেহরক্ষা করতে হবে, আর প্রায় সব ক্ষেত্রেই মৃত্যু আসে ঠিক নির্ধারিত সময়ে, তুমি তাকে ত্বরান্বিত কি বিলম্বিত করতে পারো না --- চেষ্টা করলেও। এই মুহূর্তে মৃত্যু ইচ্ছা করলেও তোমাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে দীর্ঘকাল, আর ভয়ে ভীত যে, সকল সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও, হঠাৎ তাকে হয়ত চলে যেতে হয়। মৃত্যুর ক্ষণ যেন নিয়তি নির্দিষ্ট,--- সাধারণ মানবজাতির মধ্যে অল্প কয়েকজনের আছে বিশেষ শক্তি, তাদের কথা স্বতন্ত্র। যুক্তিবুদ্ধি বলে, যাকে এড়ানো যায় না তাকে ভয় করা নিরর্থক। একমাত্র পথ হল ব্যাপারটাকে মেনে নেওয়া, তারপর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের কাজ যথাসাধ্য করে যাওয়া --- কি ঘটবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে। যারা যুক্তি বুদ্ধির সূত্র মেনে চলে সেই বুদ্ধিজীবিদের পক্ষে এই পদ্ধতিটি খুব কার্যকরী। তবে যারা হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে চালিত হয় সেই আবেগপ্রবণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ উপায় তত ফলপ্রসূ হয় না।

চৈত্য সত্তার অনুসন্ধান

নিঃসন্দেহে এ ধরনের লোকেদের দ্বিতীয় উপায় নিতে হবে। সে পথ হল চৈত্য সত্তার অনুসন্ধানের পথ। সকল ভাবাবেগের অন্তরালে সত্তার নীরব গভীরে অনির্বাণ এক আলো জ্বলছে --- সে আলো চৈত্যপুরুষের। এই আলোর সন্ধানে যাও, তার উপর মনোনিবেশ কর ; তোমার ভিতরেই সে। অখন্ড ইচ্ছার বলে তাকে নিশ্চয় খুঁজে বের করতে পারবে। তার মধ্যে প্রবেশ করলেই এক অমরত্বের বোধ পাবে তুমি। অনুভব করবে তুমি অনন্তকাল ছিলে, আর থাকবেও অনন্তকাল ধরে। শরীরের কবল থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে যাও তুমি; তোমার সজ্ঞান অস্তিত্ব শরীরের উপর নির্ভর করে না। বহু ক্ষণস্থায়ী রূপ ধরে নিজেকে প্রকাশ করে এসেছ তুমি, এই দেহ তারই একটি রূপ : মৃত্যু তো বিলোপ নয়, পারান্তর। এটি জানলে তৎক্ষণাৎ ভয় চলে যায় আর তুমি মুক্ত মানুষের শান্ত নিশ্চয়তা নিয়ে জীবনের পথে যাও এগিয়ে।

আস্থার পন্থা

তৃতীয় পন্থা হল তাদের জন্য যারা আস্থা রাখে ভগবানে, তাদের ভগবানে, যাঁর কাছে তারা পূর্ণ আত্মনিবেদন করে দিয়েছে। তারা সমগ্রভাবে তাঁরই। জীবনের সকল ঘটনা তাদের কাছে তাঁরই ইচ্ছার অভিব্যক্তি, সে সব তারা গ্রহণ করে কেবল যে শান্তভাবে বাঙ্ নিষ্পত্তি না করে তা-ই নয়, বরং কৃতজ্ঞচিত্তে। কারণ তারা নিশ্চিত জানে যে যা ঘটে তা তাদের ভালোর জন্যই ঘটে। তাদের ভগবানের উপর, তাঁর সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উপর তাদের থাকে একটা অলৌকিক নির্ভরতা। তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছা তারা নিঃশেষে নিবেদন করেছে, তারা অনুভব করে তাদের উপর রয়েছে তাঁর অবিচল ভালোবাসা আর অভয় --- জীবন মৃত্যুর দুর্ঘটনা তাতে কোন তারতম্য ঘটাতে পারে না। তাদের থাকে এই উপলব্ধি যে একান্তভাবে নিজেদের সঁপে দিয়ে তারা রয়েছে পরম প্রেমাষ্পদের চরণতলে, তাঁর দুটি বাহুর মধুর ও নিরাপদ আশ্রয়ে। তাদের চেতনায় তখন আর ভয়, দুর্ভাবনা বা আশঙ্কার স্থান নেই ; সে সবের পরিবর্তে থাকে এক শান্ত মোহন আনন্দ।

কিন্তু এ রকম অতিলৌকিক সাধক হবার সৌভাগ্য তো সকলের হয় না।

যোদ্ধার পথ

পরিশেষে, এমন লোক আবার আছে যারা জন্মযোদ্ধা।জীবন যেমন আছে, ঠিক তেমনই বলে তারা ধরে নেয় না। তাদের রক্তে স্পন্দিত অমরত্বের দাবি, এই পৃথিবীরউপরেই অমরত্বের দাবি। তাদের ভিতরে একটা সাক্ষাৎ জ্ঞান বলে দেয় যে মৃত্যু কু অভ্যাস মাত্র। তারা যেন তাকে জয় করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তবে এ জয়ের অর্থ এক নির্মম সুকৌশলী অশরীরী শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে জীবন মরণ যুদ্ধ, সে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর,প্রতি মুহূর্তে। অদম্য সাহস যার সে-ই এই বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে। এ যুদ্ধ চলে বহু রণাঙ্গনে : পরস্পর মিশ্রিত ও পরস্পরের অনুপূরক বহু স্তরে।

মনের যুদ্ধ

প্রথম যুদ্ধই প্রচন্ড : তা হল একটা সর্ব সাধারণ সর্বব্যাপী সর্বজয়ী দুর্বার ভাবের বিরুদ্ধে, যে ভাবের ভিত্তি বহু সহস্র বছরের অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতির এমন একটি নিয়ম যার এযাবৎ কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। তার রূপটি ফুটে উঠেছে এই সনাতন উক্তির মধ্যে:"এ রকমই হয়ে এসেছে অন্য রকম হতে পারে না। মৃত্যু অনিবার্য এবং অন্যরকম কিছু আশা করাই বাতুলতা।" এ বিষয়ে সকলেই একমত এবং এ পর্যন্ত শিক্ষা দীক্ষায় অতি আধুনিক বিজ্ঞানীও বিরোধী মত জানাতে সাহস পাপ নি, বলেন নি ভবিষ্যতের আশার কথা। আর নানা ধর্ম সব ?

মৃত্যুর উপরেই তাদের অধিকাংশের প্রতিষ্ঠা। তারা বলে ভগবান মানুষের মৃত্যু চান বলেই তাকে মর্ত্য করে গড়েছেন। বহু ধর্ম বলে মৃত্যু হল নিষ্কৃতি, মুক্তি, এমনকী অনেক সময়ে পুরষ্কারও। তাদের অনুশাসন হল : "ভগবানের ইচ্ছার অধীন থাকো, বিনা বিদ্রোহে মৃত্যুকে মেনে নাও, তাহলে পাবে সুখ শান্তি।" এ সবের বিরুদ্ধে মনের বিশ্বাস রাখতে হবে অটল, রাখতে হবে এক অনমনীয় ইচ্ছা। তবে মৃত্যু জয় করতে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এসব প্ররোচনা তার উপর রেখাপাত করে না, গভীর জ্ঞানের উপর স্থাপিত তার নিশ্চয়তাকে স্পর্শও করে না।

আবেগ অনুভূতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

দ্বিতীয় যুদ্ধ আবেগ অনুভবের জগতে। এ যুদ্ধ যা কিছু নিজের হাতে গড়া জিনিস, যা কিছু ভালোবাসার বস্তু --- তাদের উপর আসক্তির বিরুদ্ধে। অতি যত্নে, অনেক সময়ে দারুণ পরিশ্রমেই, তুমি গড়ে তোল তোমার সংসার, জীবিকা,একটা সামাজিক, শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক অথবা রাজনৈতিক কাজ, তোমাকে কেন্দ্র করে একটা পরিবেশ --- তার উপর তুমি নির্ভর কর ততখানি অন্তত যতখানি সে তোমার উপর নির্ভর করে। তোমাকে ঘিরে রয়েছে একদল লোক, আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মীরা। তোমার নিজের জীবনের কথা ভাবার সময় প্রায় তোমার নিজের সমান জায়গা নিয়ে উদয় হয় তারা এবং তা এতখানি জায়গা নেয় যে হঠাৎ তাদের সরিয়ে নিলে অথৈ জলে পড় তুমি, মনে হয় যেন তোমার সত্তার একটা অতি প্রধান অংশ হারিয়ে গেছে।

এসব জিনিস যে ত্যাগ করতে হবে এমন কথা নেই, যেহেতু তারা তোমার অস্তিত্বের এবং সার্থকতার জন্য অন্ততপক্ষে বহুলাংশে দায়ী। যা ত্যাগ করতে হবে তা হল এ সবের উপর আসক্তি, যাতে এদের ছাড়াও চলে তোমার, এই বোধ আসে যে এরা না থাকলেও চলবে তোমার জীবন অথবা, বলতে পারি, যাতে তারা তোমাকে ছেড়ে গেলেও নতুন অবস্থার মধ্যে সর্বদাই নতুন করে জীবন রচনা করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারো তুমি ; আর অমরত্বের অর্থ তাই। এই অবস্থার তাৎপর্য হল যে তখন যা তুমি কর তা-ই কর পূর্ণতম যত্ন এবং মনোযোগ দিয়ে অথচ সেই সঙ্গে থাকো বাসনা ও আসক্তি থেকে মুক্ত। কারণ মৃত্যুমুক্ত হতে গেলে কোন নশ্বর জিনিসের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললে চলবে না।

অনুভবের পরে সংবেদন। এখানে সংগ্রাম হয়ে ওঠে নিষ্করুণ, শত্রুরা প্রবল পরাক্রম। তোমার মধ্যে সামান্য দুর্বলতারও সন্ধান রাখে তারা, যে অঙ্গ অনাবৃত সেখানেই আক্রমণ করে। যে জয় লাভ হয় তা-ও হয় ক্ষণস্থায়ী এবং এই যুদ্ধ বার বার অনির্দিষ্টকাল ধরে চালিয়ে যেতে হয়। যে শত্রুকে মনে করলে পরাভূত সে আবার উঠে দাঁড়ায়, এবং তোমাকে বারবার

আঘাত করে। চাই দৃঢ়গঠিত চরিত্র, অশ্রান্ত সহ্যগুণ যাতে সকল পরাজয়, নিরাশা, প্রত্যাখ্যান, নিরুৎসাহকে অতিক্রম করতে পারো আর নিরন্তর নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিপরীত দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং পার্থিব ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে দেখা দেয় যে বিপুল ক্লান্তি সে সমস্তেরই ভিতর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারো তুমি।

তারপর আমরা এসে পড়ি সবচেয়ে ভীষণ সংগ্রামে, জড়ের যুদ্ধে। এ যুদ্ধ চলে দেহে। এতে বিরাম নেই, শেষ নেই। এর শুরু জন্ম থেকে আর শেষ হতে পারে যুদ্ধরত রূপান্তরের শক্তি কিংবা বিনাশের শক্তির মধ্যে একটির পতন হলে। বললাম জন্মের থেকে কারণ, প্রকৃতপক্ষে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এ দুটির সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়, অবশ্য সে সংগ্রাম সজ্ঞান চিন্তাচালিত হয় অনেক পরে। সকল রকম অসুস্থতা,ব্যাধি, অঙ্গহানি এমন কি দুর্ঘটনা পর্যন্ত, হল এই নাশকশক্তির ক্রিয়ার পরিণাম, যেমন পুষ্টি, সুসমঞ্জস সমৃদ্ধি, প্রতিরোধশক্তি, রোগ নিবারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা, প্রগতির দিকে সব রকম উন্নতি হল রূপান্তর শক্তির ক্রিয়ার পরিণাম। পরে চেতনার পরিপুষ্টি হয় যখন এই যুদ্ধও তখন সজ্ঞানে। চালিত হয় ; দুই বিপরীত গতির মধ্যে নিদারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় --- রূপান্তর না মৃত্যু, এই প্রতিযোগিতার দৌড়ে কে জয়লাভ করবে। এর অর্থ অক্লান্ত প্রয়াস, পুনরুজ্জীবনের শক্তিকে নামিয়ে আনবার জন্য অখন্ড মনোনিবেশ, শরীরের প্রতি কোষে এই শক্তি ধারণের সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলা, ধ্বংস এবং বিলয়ের সর্বনাশা শক্তিসেনার বিরুদ্ধে এক পা এক পা ফেলে একটু একটু করে যুদ্ধ জয় করে যাওয়া, ঊর্দ্ধের প্রতি যা কিছুর এষণা আছে তাকে এদের কবল সতথেকে উদ্ধার করে আনা, আলোকিত করা, পবিত্র করা, স্থায়ী করা ; এ যুদ্ধ জটিল ও দুর্জয়, আবার অনেক সময়ে যে অস্থায়ী আংশিক জয় লাভ হয় তার কোন বাহ্য লক্ষণও দেখা যায় না।

বারংবার নতুন করে কাজ শুরু করতে হয়

এক দিকে এক ধাপ লাভ হলে আবার অন্যদিকে দেখা দেয় লোকসান ; একদিন যা গড়া হয় অন্যদিন তা ধ্বসে পড়ে। বিজয় সত্যই স্থায়ী ও নির্বিঘ্ন হতে পারে তখনই যখন তা হয় সর্বাংশে বিজয়। সেজন্য প্রয়োজন --- সময়, অনেক সময় : ইতিমধ্যে দুর্বার গতিতে বছর সব চলে যায় শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে।

এর পরে পরিখার ভিতরে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকে চেতনা। ধরে থাকো, ধরে থাকতেই হবে তোমাকে, ভয় কম্পিত না হয়ে, সতর্কতার রাশ এতটুকু আলগা না করে, অবিচল শ্রদ্ধা রাখো যে আদর্শ সফল করতে হবে তার উপর, যে সহায় ঊর্দ্ধের থেকে তোমাকে চালায় ও ধরে রাখে তার উপরে। শেষ পর্যন্ত যে টিকে থাকে বিজয় তারই।

আর এ রকমে জয় করা যায় মৃত্যুভয়। তবে তা এত অল্প লোকের সামর্থ্যের মধ্যে যে

এখানে শুধু তথ্য হিসেবে উল্লেক মাত্র করা গেল। তা হল জীবিত থেকেই মৃত্যুর রাজত্বে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে প্রবেশ করা ; এবং সেখান থেকে ফিরে আসা এই স্থূল শরীরে, ফিরে এসে পূর্ণজ্ঞানে জড়জীবন যাপন করা। কিন্তু তার জন্য হতে হয় সাধক।

শ্রীমা

শ্রীমায়ের রচনা : ১২ : ৬৯ -৭৩

অমরত্ব কি

...**অমরত্ব মৃত্যুর পরে মনোময় ব্যক্তি সত্তার ঊর্দ্ধতন নয় যদিও এ জিনিসও সত্য। অমরত্ব হল জন্মহীন মৃত্যুহীন আত্মার জাগ্রত অধিকার --- দেহ সে আত্মার যন্ত্রমাত্র, ছায়ামাত্র।**

... অমরত্ব হল এমন এক জীবন যার আদি নেই অন্ত নেই, জন্ম নেই মৃত্যু নেই , যা পুরোপুরি দেহ হতে স্বতন্ত্র --- এ জীবন হল জীবাত্মার,প্রত্যেক ব্যষ্টির সারসত্তার, এবং তা বিশ্বাত্মা থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন নয়। সেই সারসত্তার রয়েছে বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে একাত্মতার অনুভব ; বস্তুত, এই সারসত্তা হল বিশ্ব-আত্মারই এক মূর্ত ব্যষ্টিভূত প্রকাশ এবং তার আদি নেই অন্ত নেই, জন্ম নেই মৃত্যু নেই , তা রয়েছে বর্তে শাশ্বত কাল ধরে আর আসলে তাই শুধু হল অমর। যখন আমরা এই জীবাত্মার সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠি, তখন আমরা তার শাশ্বত জীবনে অংশগ্রহণ করি এবং তার ফলে আমরাও হই অমর।

শ্রীমায়ের রচনা : ১০ : ২৬-২৭

যে ভুলটা প্রত্যেকে করে তা হল, ভাবা — বিশ্বাস করা — যে অমরত্বই লক্ষ্য। যদিও অমরত্ব পরিণামগুলির অন্য একটি মাত্র... এটি এক স্বাভাবিক পরিণাম মাত্র — যদি তুমি সৎ জীবন যাপন কর।

শ্রীমা: জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন, আগষ্ট ৫, ১৯৬৪

মৃত্যু বলে কিছু নেই। শুধু অমর-এরই মৃত্যু হতে পারে; মরণশীলের জন্মও নেই, বিনাশও নেই।

অমর জীবনের ক্ষেত্র থেকে মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে (তবে "মৃত্যু" বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়); 'মৃত্যু হতে পারে' অর্থ 'অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।' অমর এই অবস্থা থেকে

ওই অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে এবং আবার এদিক থেকে সেদিক যেতে আসতে পারে। আমরা একে 'মৃত্যু' বলি, কিন্তু জীবন বা মৃত্যুর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ওগুলি হল অবস্থার পরিবর্তন।

শ্রীমা: জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন, মে ১২, ১৯৬১

মানুষি প্রকৃতিতে অমরত্বের প্রয়োজন জন্মগত

একদিন, কোন উপলক্ষ্যে মনে করতে পারছি না, আমি বুঝতে পারলাম বেদের রচনাকার, আমাদের "পূর্বপুরুষেরা", কিসের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন ; অমরত্বের কারণে; অমরত্বের সন্ধানে ছিলেন তাঁরা। ওখান থেকে, বুদ্ধের দিকে নজর দিলাম এবং বুঝলাম বুদ্ধকে তাঁর পথ কে ঠিক করে দিয়েছিল; নিছকই এবং কেবল, নিত্যতার জন্য এই ধরণের প্রয়োজন; বস্তুরাজির অনিত্যতার দৃশ্য তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল, এবং তিনি অনুভব করলেন নিত্যতার প্রয়োজন। "নিত্যের" খোঁজই ছিল তাঁর সমগ্র অনুসন্ধানের বিষয় ("নিত্যতা" পেতে তিনি এত উতলা ছিলেন কেন?...)। মানুষি প্রকৃতিতে ওই রকমের অল্প কিছু জিনিস রয়েছে, গভীর মানবীয় প্রয়োজনে। এবং এরপর দেখলাম এই রকম আরেকটি প্রয়োজন; পরম নিশ্চযতার এক প্রয়োজন, যা হল সুরক্ষা...

.... জীবনের প্রয়োজনগুলির একটা হল এটি (আরও অনেক আছে); এটিই মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে যেতে এবং আরেকটি খুঁজে নিতে। এই প্রয়োজনগুলো হল (কথা'টা কী?)....বীজগুলি, বিবর্তনের অঙ্কুর। তারা আমাদের অগ্রসর হতে বাধ্য করে।

শ্রীমা: জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন, নভেম্বর ২৭, ১৯৬২

অমরত্ব সম্পর্কে জ্ঞান

কিন্তু এই " অমরত্ব " শব্দটি নিয়ে অনেকেই একটু বিভ্রান্ত হয় --- তা নতুন কিছু নয়, এ বিভ্রান্তি প্রায়শই দেখা গিয়েছে। যখন অমরত্বের কথা বলা হয়, তখন বেশির ভাগ লোকেই মনে করে যে এই দেহটাই বুঝি অনির্দিষ্ট কাল বেঁচে থাকবে।

দেহ অনির্দিষ্ট কাল ধরে বেঁচে থাকতে পারে কেবল তখনই যখন , প্রথমত, তা সেই অমর জীবাত্মা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়, তার সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে ওঠে যে লাভ করে তার সমান সামর্থ্য, সমান গুণ নিরন্তর রূপান্তরের, যা তাকে দেবে

বিশ্বগতিধারার অনুসরণে চলবার ক্ষমতা --- আর এ হল তার বেঁচে থাকবার জন্য একান্ত অপরিহার্য শর্ত। যেহেতু দেহ হল অনড়, যেহেতু তা গতিধারার অনুসরণে চলতে অক্ষম, যেহেতু বিশ্বক্রমবিকাশের সঙ্গে নিরন্তর একাত্ম হয়ে থাকবার মত যথেষ্ট দ্রুত লয়ে তা নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে না, তাই তা ভেঙে পড়ে আর এভাবেই হয় তার মৃত্যু। এই অনড়তা, এই অনমনীয়তা, নিজেকে রূপান্তরিত করবার এই অক্ষমতাই তাকে ধ্বংস হতে বাধ্য করে, যাতে তার সার পদার্থ ফিরে আসে পার্থিব সার পদার্থের সাধারণ আয়তনে, এবং যাতে তা নব নব রূপে প্রগতির ধারায় এগিয়ে চলতে পারে। তবে সাধারণত, যখন অমরত্বের কথা বলা হয়, লোকে ভাবে যে এই দেহটাই বুঝি হবে অমর --- এটা বলাই বাহুল্য যে আজ পর্যন্ত তা বাস্তবে রূপ নেয় নি।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে তা সম্ভব আর এমনকি তা ঘটবেও, কিন্তু তিনি একটা শর্ত পূরণ করতে বলছেন : তা হল এই যে দেহকে অতিমানসীভূত হতে হবে এবং অতিমানস সত্তার গুণাবলী তাকে অর্জন করতে হবে --- সে গুণগুলি হল নমনীয়তা এবং নিরন্তর আত্ম রূপান্তরের ক্ষমতা। আর শ্রীঅরবিন্দ যখন লিখছেন যে দেহ হল একটি যন্ত্র, একটি ছায়ামাত্র, তিনি বলছেন শরীর বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে এবং সম্ভবত আরও বহুকাল ধরে থাকবে, তার কথা। তা হল জীবাত্মার যন্ত্রমাত্র, অতি অপর্যাপ্ত প্রকাশমাত্র, শুধু একটি ছায়া --- এমন ছায়া যা শাশ্বত জীবাত্মার জ্যোতি ও যথাযথতার তুলনায় একান্তই ত্রুটিপূর্ণ অস্বচ্ছ কিছু।

শ্রীমায়ের রচনা : ১০: ২৭-২৮

আমাদের মধ্যে অমরত্বের উপস্থিতি

যখন একটি অতি বিরাট সংখ্যক জনসমষ্টি বলে " আমি ", সেটি হচ্ছে তাদের একটি অংশ, তাদের অনুভূতির, তাদের দেহের, তাদের চিন্তার --- যে কোন একটির হতে পারে। এটি এমন একটি জিনিস যা প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। সুতরাং, তাদের "আমি" অসংখ্য অথবা এই আমি কখনো এক থাকে না। তাহলে ভিতরের কোন্ জিনিসটি নিত্য স্থিতিশীল ? নিশ্চয়ই চৈত্যপুরুষ।কারণ কোন কিছুকে নিত্যস্থিতিশীল হতে হলে প্রথমে তাকে অমর হতে হবে; নতুবা তা নিত্যস্থিতিশীল হতে পারবে না। পরে যে সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যে যায় --- তার উপর নির্ভরশীল হওয়া চলবে না। সে নিজে কোন না কোন অভিজ্ঞতা সমষ্টি হতে পারে না। সুতরাং নদীর তলদেশ নদীকে গড়ে না। নদীতল একটি অবস্থানমাত্র। তুলনাটি যদি আরো একটু বিশদ কর (কিন্তু তুলনা করা নিরর্থক, কেননা মানুষ যা চায় তাই সেখানে পাবে)। বলা যেতে পারে নদী জীবনের একটি ভাল প্রতীক --- নদীতে সর্বদা যা রয়েছে তা হল " জল ", তা সর্বদা একই

জলবিন্দু নয় --- কিন্তু জল --- জল ছাড়া নদী হতে পারে না। আর মানুষের মধ্যে যা স্থায়ী তা হল " চেতনা " নামক বস্তুটি ! যেহেতু তার মধ্যে চেতনা রয়েছে তাই সে স্থায়ী। দেহ স্থায়ী নয় --- যা স্থায়ী তা হচ্ছে চেতনা --- সেই শক্তি যা এই দেহগুলোকে বেঁধে রাখে --- এই সমস্ত জিনিসের ভিতর দিয়ে যা যেতে পারে। শুধু স্মৃতিটি বহন করেই নয় (স্মৃতি অত্যন্ত বাইরের জিনিস) পরন্তু চেতনার অনুরূপ স্পন্দনটিও ধারণ করে।

শ্রীমায়ের রচনা : ৪ :১৫৩-৫৪

হ্যাঁ, ঠিক তাই, চৈত্যপুরুষ এই সমগ্র সংগঠনের পিছনে রয়েছে, মানুষের জীবন এবং চেতনার ত্রিবিধ সংগঠনের পিছনে থেকে চৈত্যপুরুষ তার অমর চেতনার দ্বারা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কেবলমাত্র চৈত্যপুরুষ আছে বলেই আমাদের অবিচ্ছিন্নতার।

এত পরিষ্কার ধারণা রয়েছে। তা না হলে, তুমি এখন যেমন, তার সঙ্গে তিন বছর বয়সে যা ছিলে তা যদি তুলনা কর তাহলে স্বভাবতই দেহের প্রাণের ও মনের দিক থেকে কোনভাবেই নিজেকে চিনতে পারবে না--- কোনরকমের সাদৃশ্যই নেই। কিন্তু এ সবের পিছনে রয়েছে চৈত্যপুরুষ, যে সত্তার বিকাশ এবং তার পরিণতিকে সাহায্য করে, আর চেতনার ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে। এই চৈত্যপুরুষই মানুষকে অনুভব করতে সাহায্য করে যে, সে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও সেই একই সত্তা ; যদি পরে যে সব মানুষ নিজেকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে তাহলে সে দেখতে পাবে, আগে যে সব জিনিস সে বুঝতে এবং করতে পারত, সেগুলো এখন তার কাছে চিন্তার অতীত, এবং তেমনটা আর সে কখনো করতে পারবে না, কারণ, সে এখন আর সেই মানুষ নয়। অথচ তাহলেও তার মধ্যে রয়েছে চৈত্য চেতনা, যা হল অমর চেতনা, তাই সে অনুভব করতে পারে যে সেই একই সত্তা, অল্পবিস্তর প্রগতিশীল এবং অল্পবিস্তর সচেতন পরিবর্তন সহ, যা তখনও ছিল, এখনও রয়েছে এবং পরেও থাকবে।

শ্রীমায়ের রচনা : ৭ : ২২৪

অমরত্বের অমৃত

প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের রয়েছে ভগবানের কাছে পৌঁছবার তার বিশেষ পথটি। শ্রীঅরবিন্দ সেই সব পথকেই তুলনা করেছেন বিভিন্ন ধরনের কলসীর সঙ্গে। কিন্তু তিনি বলছেন : কোন্ পথটি ধরে তুমি চলছ তাতে বড় একটা এসে যায় না, একমাত্র লক্ষ্যটিই হল আসল, আর যে পথ ধরেই তুমি চল না কেন লক্ষ্য তো সেই একই ; যে কলসীতেই থাকুক না অমৃত তো সে একই।

কেউ কেউ বলে পাত্রের গন্ধ অমৃতের স্বাদ পাল্টে দেয় অর্থাৎ যে পথ ধরে তুমি চলেছ তা ভগবানের সঙ্গে তোমার মিলনে হেরফের ঘটায়। এবং শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বলছেন : পৌঁছবার ধরণ হয়ত আলাদা এবং প্রত্যেকে বেছে নেয় আপন পছন্দ অনুযায়ী বা তার রুচির সঙ্গে সব থেকে খাপ খায় যেটি সেটিকেই, কিন্তু অমৃতেই, ভগবানের সঙ্গে মিলনের মধ্যেই তো সর্বদা রয়েছে সেই অমরত্ব প্রদায়িনী শক্তি।

ধর, কেউ যখন বলে যে ভগবানের সঙ্গে মিলনের সহায়ে অমরত্বের চেতনা লাভ করা যায়, তাতে বোঝায় এই যে আমাদের আন্তর চেতনা এমন কিছুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ধরে যা অমর এবং ফলে নিজেকেই অমর বলে অনুভব করে। আমরাই সচেতন হয়ে উঠি সেই সব জগৎ সম্বন্ধে যেখানে অমৃতত্বের অধিষ্ঠান। কিন্তু তাতে এটা বোঝায় না যে দেহ যা দিয়ে গড়া তা রূপান্তরিত হয়েছে, তা অমর হয়ে উঠেছে। তার জন্যে সম্পূর্ণ অন্য এক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ; এবং তোমাকে শুধু সেই চেতনা লাভ করলেই হবে না, বস্তুত তা আবার নামিয়ে আনতে হবে অন্নময় জগতে, এবং তাকে শুধু শারীর চেতনার রূপান্তরের কাজ করতে দিলেই চলবে না, শরীর যা দিয়ে গড়া তারও রূপান্তর ঘটাতে দিতে হবে এবং সেটা খুবই বিরাট কাজ।

শ্রীমায়ের রচনা : ১০ : ৭৩

পৃথিবীতে অমরত্বের প্রকাশ

মনুষ্যজাতি যখন প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল, তখন অহং ছিল ঐক্য সাধনের উপাদান। অহং-এর চতুর্দিকে বিভিন্ন স্তরের সত্তারা শ্রেণীভুক্ত হত ; কিন্তু এখন অতিমানস জাতির জন্মের প্রস্তুতি চলছে, তাই অহংকে অদৃশ্য হয়ে তার জায়গায় চৈত্যপুরুষকে স্থান দিতে হবে। মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রকাশের জন্য চৈত্যপুরুষ ধীরে ধীরে গঠিত হয় দিব্য হস্তক্ষেপে।

চৈত্যপুরুষের প্রভাবে ঈশ্বর মানব সত্তায় প্রকাশিত হয় এবং এইভাবে অতিমানব জাতির আগমনের প্রস্তুতি নেয়।

চৈত্যসত্তা অমর এবং চৈত্যসত্তার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে অমরতা প্রকাশিত হতে পারে।

কাজেই এখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিজের চৈত্যপুরুষের সন্ধান করা, তার সঙ্গে মিলিত

হওয়া এবং অহং-এর স্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। তবেই অহং হয় রূপান্তরিত না হয় অদৃশ্য হতে বাধ্য হবে।

শ্রীমা

শ্রীমায়ের রচনা : ১৬ :৩৮৮

চৈত্যের প্রভাবাধীনে ভগবান মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হন, এবং এইভাবেই অতিমানবের আবির্ভাবের প্রস্তুতি চলে। চৈত্য পুরুষ অমর, সুতরাং এরই মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রকাশ পেতে পারে অমরত্ব।

অতএব, এখনকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল নিজের চৈত্য সত্তাকে আবিষ্কার করা, এর সঙ্গে মিলন ঘটানো, একে অহং-এর স্থলাভিষিক্ত করা; এতে অহং বাধ্য হবে, হয় নিজেকে পরিবর্তন করতে, আর না হয় মিলিয়ে যেতে।

জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন: ফেব্রুয়ারি ৮, ১৯৭২

বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাতিক অভিমত

একমাত্র বিজ্ঞানই যার চর্চা করেছে, সেই শারীরিক বিবর্তনের তথ্যগুলো থেকে যুক্তিতর্ক দ্বারা এবং এই সীমারেখার বাইরের সকল সম্ভাবনাগুলিকে বাদ দিয়ে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বিজ্ঞানের পক্ষে যুক্তিযুক্ত, এবং, এক যুক্তিসম্মত অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে, আত্মার অমরত্বকে অস্বীকার করা'টা এর দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত। কারণ মনস্তাত্বিক কার্যকলাপগুলো যদি হয় পার্থিব জীবনের নিছকই এক পরের এবং সাময়িক ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের আপন স্থায়িত্বের জন্য শরীরের উপর নির্ভরশীল হয়, এর অর্থ হল যে, মৃত্যু নামক রহস্যের মাধ্যমে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের গতি রুদ্ধ হয়ে পার্থিব জীবন যখন শেষ হয়, তখন মানুষি ব্যক্তিত্ব, যা কি না এক মনস্তাত্বিক ক্রিয়া, তারও সমাপ্তি অবশ্যই ঘটবে। দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটবে; গাছের ফুল যেমন পারে না গাছের থেকে বেশিদিন টিকে থাকতে, বাড়ি যেমন ভিতটা নষ্ট হলে ভেঙে পড়ে, তেমনই আত্মারও স্থায়িত্ব দেহের চেয়ে বেশি নয়। দেহ হল গাছের কাণ্ড, আত্মা হল ফুল; দেহ হল ভিত, আত্মা এক লঘুভার ও অস্থায়ী উপরিকাঠামো (Superstructure)। হিন্দু চিন্তাধারা এগুলিকে সরাসরি অস্বীকার করে। এ দাবি করে যে এ মনস্তাত্বিক জীবন অনুসন্ধানের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে ততটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, যতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

বিজ্ঞান পার্থিব প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পারে, এবং এর অনুসন্ধানের আলোকে এ ঘোষণা করেছে শরীরের আগে আত্মার অস্তিত্ব এবং দেহের মৃত্যুর পরও এর অস্তিত্ব থাকে। মানসিক থেকে ক্রমবিকাশের ফলেই পার্থি

জীবন আর এ মানসিক কার্যকলাপের পরবর্তীকালের এবং সাময়িক ক্রিয়ার বেশি কিছু নয়। দেহ হল ফুল এবং আত্মা গাছের কাণ্ড; আত্মা হল ভিত এবং দেহ হল ভঙ্গুর এবং ক্ষণস্থায়ী উপরিকাঠামো।

CWSA 17: 236-37

আমাদের অভ্যন্তরস্থ অবিনশ্বর আত্মা

আত্মাকে বর্ণনা করা হয়েছে জীবন এবং জড়ের মধ্যে দিব্য অগ্নির এক স্ফুলিঙ্গ হিসাবে, ওটি একটি প্রতিচ্ছবি। এটি চেতনার স্ফুলিঙ্গ হিসাবে বর্ণিত হয়নি।

মানস, প্রাণিক, শারীর চেতনার অস্তিত্ব রয়েছে — চৈত্যিক থেকে পৃথক। চৈত্য সত্তা এবং চেতনা অভিন্ন নয়।

আত্মা বা "দিব্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গ" যখন এক চৈত্যিক ব্যষ্টিত্ব বিকশিত করতে শুরু করে, সেই চৈত্যিক ব্যষ্টিত্বকে বলা হয় চৈত্য সত্তা।

একটা সংগঠিত প্রাণ এবং মনের বিকাশের আগে থেকেই বিরাজমান আত্মা বা স্ফুলিঙ্গ। আত্মা হল ভগবানের কিছুটা যে বিবর্তনের ভিতরে নেমে আসে, এর মধ্যে এক দিব্য তত্ত্ব হিসাবে, অজ্ঞানতা থেকে বের করে জ্যোতির মধ্যে ব্যক্তির বিবর্তনে সহায় রূপে। বিবর্তন চলাকালে এ গড়ে তোলে এক চৈত্যিক ব্যষ্টি বা আত্মার ব্যষ্টিত্ব যা এক জীবন থেকে পরবর্তী জীবনে বৃদ্ধি পেতে থাকে, বিকশিত মন, প্রাণ ও দেহকে এর যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এই আত্মাই হল অবিনশ্বর, বাকি সব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; এক জীবন থেকে পরবর্তী জীবনে এ প্রবেশ করে অভিজ্ঞতার সার এবং ব্যষ্টির বিবর্তনের ধারাবাহিকতা বহন করে।

সমগ্র চেতনা, এ ছাড়াও মন, প্রাণ এবং দেহকে ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং উচ্চতর চেতনার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, আর সংযুক্ত একবার হয়ে গেলে, উচ্চতর'কে তাদের মধ্যে নেমে আসতে হবে। ওই সবকিছুর পিছনে রয়েছে চৈত্য ও এর সহায়তা।

CWSA 28: 119-20

দেহের অমরত্ব নয়, পরন্তু দেহে অমরত্বের চেতনা যা আসতে পারে জড়ের ভিতরে বা এমনকী প্রাকৃত মনের মধ্যে অধিমানসের অবতরণের সঙ্গে, বা প্রাকৃত মনশ্চেতনায় পরিবর্তিত অতিমানস জ্যোতির স্পর্শের সঙ্গে। এগুলি প্রাথমিক উন্মীলন, কিন্তু তারা জড়ের ভিতরে অতিমানস পরিপূর্ণতা নয়।

CWSA 28: 119-20

আমাদের অভ্যন্তরস্থ ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়ে আমরা স্বাধীন, সংসারের বন্ধন এবং মৃত্যুর পাশ থেকে মুক্তি পেতে পারি। কারণ ভগবানই মোক্ষ, ভগবানই অমরত্ব। মৃত্যুর ওপারে গিয়ে আমরা ভোগ করি অমরত্ব।

CWSA 17: 304

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে অমরত্ব

অমরত্বের পথ

মৃত্যুর অধীন এবং মর্ত্যজীবনের "অনেক মিথ্যার" জড়ীয় বিশ্বে মানুষের বাস। মৃত্যুর ঊর্ধ্বে উঠতে হলে এবং অমরগণের একজন হতে হলে, তাকে মিথ্যা থেকে পরম সত্যের অভিমুখে ঘুরতে হবে; তাকে ঘুরতে হবে জ্যোতির দিকে, এবং অন্ধকারের শক্তিগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং বিজয়ী হতে হবে। এটি সে করে দিব্য শক্তিসমূহের সংস্পর্শে এসে এবং তাদের সাহায্যে; আবাহনের দ্বারা সাহায্য নামিয়ে আনার গূঢ় রহস্য জানা ছিল বৈদিক অতীন্দ্রিয়বাদীদের। এই উদ্দেশ্যে বাহ্যিক ত্যাগের প্রতীকগুলি দেওয়া হয় একটা অভ্যন্তরীণ অর্থ লুকানো রহস্যের আকারে এবং সারা বিশ্ব জুড়েই এই পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়ে থাকে; তারা জ্ঞাত করে মানুষের অভ্যন্তরে দেবতাদের এক আহ্বান, সম্বন্ধযুক্ত এক ত্যাগ, একটা অন্তরঙ্গ বিনিময়, একটা পারস্পরিক সাহায্য, একটা যোগাযোগ। বিকশিত হয় মানুষের মধ্যে দেবসত্তাদের শক্তিরাজি এবং তার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির বিশ্বজনীনতার এক রূপায়ণ। কারণ দেবতারা হলেন অভিভাবক এবং পরম সত্যের বৃদ্ধিসাধক, অমরের শক্তিরাজি, অনন্তবত্ ভগবতী জননীর পুত্রেরা: অমরত্বের পথ হল দেবতাদের ঊর্ধ্বগামী পথ, পরম সত্যের পথ, একটা যাত্রা, এক ঊর্ধ্বগমন যার দ্বারা সত্যের বিধানের মধ্যে বিকাশ "ঋতস্য পন্থাঃ", মানুষ অমরত্বে পৌঁছয় শুধুমাত্র তার অন্নময় সত্তার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে গিয়ে নয়, পরন্তু তার মানসিক এবং সাধারণ চৈত্য প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে উচ্চতম স্তর ও পরম সত্যের পরম ব্যোমে পৌঁছিয়ে; কারণ সেখানেই

রয়েছে অমরত্বের ভিত্তি এবং ত্রিধা অনন্তের স্বধাম। এই ধারণাগুলির উপর বৈদিক ঋষিরা এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও চৈত্যিক শিক্ষার পত্তন করেছিলেন, যে শিক্ষা নিজেকে ছাড়িয়ে চালিত করেছে এক উচ্চতম আধ্যত্মিকতার দিকে এবং যার মধ্যে ধরা ছিল পরবর্তীকালের ভারতীয় যোগের মূল অংশ। ইতিমধ্যেই তাদের বীজের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অধিকাংশ চরিত্রগত ধারণা, যদিও পূর্ণ বিস্তারে নয়। রয়েছে সেই একক পরম সত্তা, একম সৎ, ব্যষ্টি এবং বিশ্বের ঊর্ধ্বে বিশ্বোত্তীর্ণ। ভগবান এক, যিনি তার দেবসত্তার নানা রূপ, নাম, শক্তি, ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হন। জ্ঞান আর অজ্ঞানতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, মর্ত্যজীবনের অনেক মিথ্যা বা সত্য ও মিথ্যার মিশেল-এর বিপরীতে এক অমর জীবনের মহত্তর সত্য। দেহ থেকে চৈত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্তায় মানুষের অভ্যন্তরীণ উন্নতির শিক্ষা সেখানে রয়েছে। আছে মৃত্যুর উপর বিজয়, অমরত্বের গোপন রহস্য, মানবাত্মার আয়াসসাধ্য দেবত্বের উপলব্ধি। একটা যুগে যেখানে আমরা আমাদের উপরভাসা জ্ঞানের ঔদ্ধত্যে মানবজাতির শিশুকালের বা বড় জোর প্রবল বর্বরতার একটা সময়ের মত পিছনে ফিরে তাকাতে অভ্যস্ত, এ ছিল প্রত্যাদিষ্ট এবং অন্তর্জ্ঞানলব্ধ চৈত্যিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা যার দ্বারা পুরাকালের পিতৃপুরুষেরা " পূর্বে পিতরঃ মনুষ্যাঃ" এক মহৎ এবং অসামান্য সভ্যতার প্রবর্তন করেছিলেন।

CWSA 20: 202-03

অমরত্বের লাভের যোগ্য কে

সেই প্রকৃত সত্য কি ? সেই উচ্চতম উদ্দেশ্য কি? তাহা এই — যুগে-যুগে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমরত্ব লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। এই যোগ্যতা কিরূপে আসিবে? কোন মনুষ্য প্রকৃত যোগ্য? যিনি নিজেকে শুধু শরীর ও প্রাণ বলিয়াই মনে করেন না, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াই যিনি জাগতিক সত্যাসত্য নির্ণয় করেন না, যিনি নিজেকে এবং সকলকেই আত্মা বলিয়াই জানেন, যিনি আত্মার মধ্যে বাস করিতে শিখিয়াছেন, যিনি অপরের সহিত শারীরিক জীব-ভাবে নহে, আত্মা-ভাবেই ব্যবহার করেন — তিনি অমরত্ব লাভের প্রকৃত যোগ্য: কারণ মৃত্যুর পরও থাকাই অমরত্ব নহে — কারণ মন লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পরও থাকে। জন্ম-মৃত্যুর উপরে উঠাই প্রকৃত অমরত্ব। মনোময় দেহ ছাড়াইয়া মানুষ যখন আত্মারূপে আত্মার মধ্যেই বাস করে তখনই তাহার প্রকৃত অমরত্ব লাভ হয়। যাহারা শোক-দুঃখের অধীন, চিত্তাবেগ ও ইন্দ্রিয়ের দাস, অনিত্য বিষয়সমূহের স্পর্শ লইয়াই যাহারা ব্যস্ত তাহারা অমরত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারে না। যতদিন এই সকলকে জয় করিতে পারা না যাইতেছে, ততদিন ইহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে — শেষে এমন একদিন আসিবে যখন

ইহারা মুক্ত পুরুষকে আর ব্যাথা দিতে পারিবে না। যে অনন্ত শান্ত আত্মা গুপ্তভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছেন, তিনি যেমন জ্ঞান, সমতা ও শান্তির সহিত সংসারের সমস্ত ঘটনা গ্রহণ করেন — মুক্ত পুরুষও তেমনই শান্তভাবে সংসারের সুখ দুঃখ গ্রহণ করিতে পারিবেন। অর্জুনের মত দুঃখ ও ভয়ে বিচলিত হওয়া, তাহাদের দ্বারা কর্ত্যব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া, আত্মকৃপা এবং অসহ্যবোধে দুঃখ দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবশ্যম্ভাবী তুচ্ছ শারীরিক মৃত্যুর সম্পর্কে শিহরিয়া উঠা— ইহা অনার্যোচিত অজ্ঞান। যে আর্য শান্ত শক্তির সহিত অমরত্বে উঠিতে চাহিবে— এ পথ তাহার নহে।

সেই একক অব্যয় আত্মা

মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই। কারণ শরীরই মরে, কিন্তু শরীর মানব নহে। যাহা নিত্য বস্তু তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না— তবে তাহা ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতে পারে, শুধু আকারের পরিবর্তন হইতে পারে। তেমনই যাহা অনিত্য তাহার কোন সত্তা থাকিতে পারে না। এই সৎ ও অসতের তফাৎ উপলব্ধি হইলে বুঝা যায় যে আত্মা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে— কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। দেহের বিনাশ আছে, কিন্তু যাহার এই দেহ যিনি এই দেহকে ব্যবহার করেন, সেই আত্মা অনন্ত, অপ্রমেয়, নিত্য, অবিনাশী। যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে— ইহাতে শোক করিবার কি আছে? পশ্চাৎপদ হইবার বা শিহরিয়া উঠিবার কি আছে? ইহা জন্মায় না, মরেও না। ইহা এরূপ বস্তু নহে যে, উৎপন্ন হইয়া লোপ পাইয়া আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। ইহা অজ, শাশ্বত, পুরাণ— শরীরের বিনাশ হইলেও ইহা হত হয় না। অমর আত্মার বিনাশ সাধন কে করিতে পারে? শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহা স্থাণু, অচল, সর্বব্যাপী, সনাতন। ইহা শরীরাদির ন্যায় ব্যক্ত নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে— তবে ইহা সকল ব্যক্ত বস্তু অপেক্ষা বড়। চিন্তার দ্বারা ইহাকে ধরা যায় না— তবে ইহা সকল মন অপেক্ষা বড়।প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহার বিকার হয় না, পরিবর্তন হয় না—ইহা দেহ, মন, প্রাণের পরিবর্তনের অতীত— তবে ইহা সেই সত্য বস্তু, এই সকল যাহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জন্ম ও মৃত্যু ধারাবাহিকতার ক্রম

যদি ইহাই সত্য হয় যে আমাদের সত্তা তত মহান্ নহে, তত বিরাট নহে, যদি মনে করা যায় যে আত্মা নিত্য দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে ও দেহের সহিত মরে— তথাপি জীবের মৃত্যুতে শোক করা উচিৎ নহে। কারণ আত্মার স্বপ্রকাশের জন্য জন্ম মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মের পূর্বে যে আত্মা থাকে না, তাহা নহে। জন্মের পূর্বে আত্মা এরূপ অবস্থায় থাকে যাহা আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর, অব্যক্ত — এই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হওয়া, ইন্দ্রিয়ের গোচর হওয়াই আত্মার জন্ম। মৃত্যুকালে আত্মা আবার সেই অব্যক্তাবস্থায় ফিরিয়া যায়, এই অবস্থা হইতে আবার তাহা ব্যক্ত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। রোগেই মৃত্যু হউক আর যুদ্ধেই মৃত্যু হউক— মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়-মনের যে শোক তাহা নিতান্ত অজ্ঞান, স্নায়বিক আর্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যখন মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করি তখন অজ্ঞানের বশে এমন লোকের জন্য শোক করি যাহাদের জন্য শোক করিবার কোন কারণই নাই— কারণ তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায় না, তাহাদিগকে কোন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় পরিবর্তন সহ্য করিতে হয় না, বরং মৃত্যুর পরেও তাহারা থাকে এবং জীবিতাবস্থার অপেক্ষা কম সুখে থাকে না।

কিন্তু বাস্তবে আমাদের সত্তা খুবই মহান। সকলেই সেই আত্মা, এক ব্রহ্ম— যাহাকে কেহ-কেহ আশ্চর্যের ন্যায় বোধ করেন, কেহ আশ্চর্যবৎ বলেন বা আশ্চর্যবৎ শ্রবণ করেন। কারণ তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত— আমাদের সকল জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞানীদের নিকট তত্ত্বকথা শ্রবণ সত্ত্বেও সেই পরব্রহ্মকে এ পর্যন্ত কোন মানব-মনই স্বরূপত জানিতে পারে নাই। ইনিই জগতের আবরণের আড়ালে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, ইনিই শরীরের প্রভু— সমস্ত জীবন ইঁহারই ছায়া মাত্র। আত্মার শারীরিক মূর্তি গ্রহণ এবং মৃত্যুর দ্বারা এই অবস্থা পরিত্যাগ— এ সকল তাঁহারই একটি সামান্য লীলা। যখন আমরা নিজদিগকে এ ভাবে জানিব তখন নিজদিগকে হন্তা বা হত বলার কোন অর্থই থাকিবে না। মানব-আত্মা জন্ম ও মৃত্যুরূপ অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। মাঝে-মাঝে পরলোকে বিশ্রাম করিতে, আবার ইহলোকের সুখ-দুঃখ, যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব, জয়-পরাজয়কে উন্নতিরই সহায় করিয়া ক্রমশ অমরত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে— ইহা সেই পরব্রহ্মেরই লীলা, তাঁহারই অভিব্যক্তি। ইহাই একমাত্র প্রকৃত সত্য, জীবনে আমাদিগকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে, এই পরম সত্যের আলোকেই আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

গীতা নিবন্ধ: পৃ ৫২-৫৪ অখিল

গভীরতর অর্থে অমরত্ব

অমরত্ব বলিতে প্রাচীন অধ্যাত্ম শিক্ষায় কখনই শরীরের মৃত্যুর পর কেবল ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বুঝায় নাই; সে অর্থে সকল সত্তাই অমর, কেবল রূপেরই ধ্বংস হয়। যে-সকল জীব মুক্তিলাভ করে না, তাহারা যুগবিবর্তনের ধারায় জীবনযাপন করিয়া চলে; ব্যক্ত জগৎ-সকলের প্রলয় হইলে সকলেই ব্রহ্মের মধ্যে লীন বা গুপ্ত থাকে, নূতন কল্পারম্ভে আবার তাহারা জন্মগ্রহণ করে। প্রলয় হইতেছে এক ক্লিপের অন্ত, তাহাতে একটি বিশিবরূপের সাময়িকভারে ধ্বংস হয় এবং তাহার সহিত যত ব্যষ্টিরূপ ঘুরিতেছে তাহাদেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু তাহা হইতেছে একটা সাময়িক বিরতি মাত্র, একটা নীরব অবকাশের পরে আবার প্রকটিত হয় নূতন সৃষ্টি, নূতন সমাহার, পুনর্গঠন, তাহাতে তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাহাদের প্রগতির প্রেরণাশক্তি ফিরিয়া পায়। আমাদের দৈহিক মৃত্যুও একটা প্রলয়, গীতা এখনই ঐ শব্দটিকে এই মৃত্যুর অর্থেই ব্যবহার করিবে, প্রলয়ম যান্তি দেহভৃৎ, দেহধারী জীব প্রলয়প্রাপ্ত হয়। জড়ের যে রূপকে অজ্ঞানের বশে সে নিজ সত্তা বলিয়া মনে করিয়াছে, এবং এখন যাহা পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে তাহারই প্রলয় হয়। কিন্তু জীবাত্মা নিজে বর্তমান থাকে এবং কিছুকাল পরে পঞ্চভূত হইতেই নির্মিত নূতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মজন্মান্তর চক্রে ঘুরিয়ে থাকে, ঠিক যেমন বিশ্ব-পুরুষ কিছুকাল বিশ্রাম ও বিরতির পর আবার কালচক্রে তাঁহার অন্তহীন আবর্তন আরম্ভ করেন। কালচক্রের আবর্তমে এই যে অমরত্ব ইহা সকল দেহধারী আত্মারই আছে।

গভীরতর অর্থে যে অমরত্ব তাহা এইরূপ মৃত্যুর পরেও উদ্বর্তন এবং পুনঃ-পুনঃ আবর্তন হইতে পৃথক জিনিস। অমরত্ব হইতেছে সেই পরমপদ যাহাতে আত্মা জানে যে, সে ডন্ম-মৃত্যুর অতীত, নিজের প্রকাশনের স্বরূপের দ্বারা সে সীমাবদ্ধ নহে, সে অনন্ত, অক্ষয়, অপরিবর্তমান শাশ্বত,— অমর কারণ সে কখনও জন্মায় নাই, তাই কখনও মরে না। ভাগবত পুরুষোত্তম, তিনি পরম ঈশ্বর এবং পরমব্রহ্ম, তিনি অমর শাশ্বততার চির অধিকারী, শরীর গ্রহণ করিলে বা অনবরত নানা বিশ্বরূপ, বিশ্বশক্তি পরিগ্রহ করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কারণ তিনি সর্বদা এই আত্মদানে বাস করেন। তাঁহার স্বরূপই হইতেছে নিজের শাশ্বততা সম্বন্ধে অবিক্রিয় ভাবে সচেতন থাকা; তাঁহার যে আত্মজ্ঞান তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি এখানে সকল দেহেরই দিব্য অধিবাসী, কিন্তু প্রত্যেক দেহে তিনি অজাত, সে-আবির্ভাবের দ্বারা তাঁহার চৈতন্যে তিনি সীমাবদ্ধ হন না, তিনি যে দৈহিক প্রকৃতি পরিগ্রহ করেন তাহার সহিত এক হইয়া পড়েন না; কারণে সেইটি গৌণ ঘটনা মাত্র। পুরুষোত্তমের এই যে নিত্য-সচেতন শাশ্বত সত্তা ইহার মধ্যে বাস করাই মুক্তি, অমৃতত্ব। কিন্তু এখানে এই মহত্তর অধ্যাত্ম অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে দেহধারী জীবকে নিম্নতর প্রকৃতির ধর্ম অনুসারে জীবনযাপন করা বন্ধ করিতেই হইবে;

ভগবানের যে পরম জীবনধারা তাহারই ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, বস্তুত সেইটিই তাহার নিজের মূলসত্তার প্রকৃত ধর্ম। যেমন তাহার নিগূঢ় আদি সত্তায় তেমনি তাহার জীবনের অধ্যাত্ম বিকাশধারাতেও তাহাকে ভগবানের সাদৃশ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

গীতা-নিবন্ধ: পৃ ৪২২-২৩

বৃহত্তর সম্ভাবনা

যেহেতু এটা স্বীকৃত যে, মনোময় অস্তিত্বের চেয়ে রয়েছে একটা আরও বাস্তব অস্তিত্ব, রয়েছে পার্থিব জীবনের চেয়ে একটা বৃহত্তর জীবন, এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, রূপধারী অবর জীবন ও আনন্দই সব যার উপাসনা মানুষ এখানে সাধারণত করে থাকে এবং যাকে লক্ষ্য হিসাবে নেয়, সেটি আর জাগরিত আত্মার বাসনার বস্তু হতে পারে না। তাঁর আস্পৃহা অবশ্যই হবে ঊর্ধ্বগামী; তাঁর নিজেকে বিযুক্ত করতে হবে মৃত্যু এবং ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর এই জগৎ থেকে, তাদের ঊর্ধ্বে তাঁর সত্যকার অমরত্বের ক্ষেত্রে নিজে হয়ে উঠতে পারে। একমাত্র তখনই সে অস্তিমান, যখন এখানে এই মর্ত্যজীবনেই নিজেকে মুক্ত করতে পারে মর্ত্য চেতনা থেকে এবং অমর ও শাশ্বত কী তা জানতে পারে এবং হতে পারে। অন্যথায় সে অনুভব করে যে সে পথভ্রষ্ট, তার সত্যকার মুক্তি তার অধরা হয়ে গেছে।

CWSA 18: 16-17

আমরা নিজেদেরকে অস্বীকার করি নিজেদেরকে আবিষ্কার করার জন্যে; কারণ মনোময় জীবণে রয়েছে শুধু একটা অন্বেষণ, কিন্তু মনকে ছাপিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত ফলাফল কখনই নয়। সুতরাং আমাদের সকলের মানসিকতার পিছনে রয়েছে আমাদের নিজেদের একটা পরিপূর্ণতা যাকে আমাদের মনে হয় আমরা যা তার সঙ্গে এর রয়েছে এক বিরোধাভাস এবং বৈপরীত্য। কারণ এখানে আমরা অবিরাম হয়ে উঠছি; সেখানে আমাদের শাশ্বত সত্তা আমাদের অধিগত। এখানে আমাদের নিজেদের ধারণায় আমরা এক বিকশিত পরিবর্তনশীল চেতনা এবং কালের প্রবেগে এক বাধাগ্রস্ত প্রচেষ্টার দ্বারা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছি; ওখানে আমরা এক অবিকারী চেতনা, কাল তার প্রভু নয়, পরন্তু যন্ত্র এবং সেই সাথে এর সৃষ্টি এবং এর নজরে থাকা যা সবকিছু তার ক্ষেত্র। এখানে আমাদের বাস মর্ত্যচেতনার এক সংগঠনের মধ্যে, যা রূপ নেয় একটা ক্ষণস্থায়ী জগতের; সেখানে আমরা মুক্তি পাই এক অনন্ত আত্ম-দর্শনের সৌষম্যের মধ্যে, সমগ্র জগৎকে যে জানে শাশ্বত আর অমর্ত্যের আলোতে।"ওপার" আমাদের

সত্য, ওটিই আমাদের সমৃদ্ধি; ওতেই স্ব-প্রতিষ্ঠিত আমাদের পরম পরিতৃপ্তি। এটাই অমরত্ব এবং এটিই "সেই পরমানন্দ"।

CWSA 18: 22-23

ব্রহ্মের উপলব্ধি

ব্রহ্মের উপলব্ধি হল মর্ত্য স্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে অমরত্বে প্রবেশ, যার থেকে আমরা বুঝি, মৃত্যুর উদ্বর্তন নয়, পরন্তু জন্ম ও মৃত্যুর দ্বৈত প্রতীকের বাইরে সনাতন সত্তায় আমাদের প্রকৃত স্বরূপের আবিষ্কার এবং আনন্দ। অমরত্ব বলতে আমরা বুঝি জন্ম ও মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে ধারণশীল দেহে ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্তনীয় জীবনের বিপরীত আত্মার নিরঙ্কুশ জীবন এবং যে মনোময় সত্তার বাস অসহায়ভাবে পৃথিবীতে জন্ম ও মৃত্যুর এই বিধানের অধীন হয়ে বা মনে হয় যে অন্তত তার অজ্ঞানতা বশে এর এবং নিম্ন প্রকৃতির অন্যান্য বিধানের অধীন হয়ে, সেই নিছক মনোময় সত্তার চেয়ে শ্রেয় জীবন এর জীবনের চেয়ে প্রকৃষ্ট জীবন। মুক্ত, অনন্যসাপেক্ষ, নিজের প্রভু এবং এপ্রিল মূর্তরূপগুলিকে জানা এবং এর অধিকারী হওয়াটাই আত্মার অতিস্থিতির (Transcendence) উপায় এবং একে জানা এবং অধিগত করা হল ব্রহ্মকে জানা এবং অধিগত করা। এ ছাড়াও এ হল মর্ত্য জগৎ থেকে অমর জগতে, বন্ধনের জগৎ থেকে বিশালতার জগতে, সান্ত বিশ্ব থেকে অনন্ত বিশ্বে উত্তরণ। এ হল জাগতিক আনন্দ ও দুঃখ থেকে এক বিশ্বাতীত পরম সুখের মাঝে অধিষ্ঠান।

মর্ত্য জগতে বিষয়সমূহের প্রতি আমাদের আসক্তি বিসর্জন দিয়ে এটি করতেই হবে। যদি আমাদের একত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্ত হতে হয় তাহলে এর মৃত্যু এবং দ্বৈবিধ্যগুলোকে অবশ্যই আমাদের থেকে ঠেলে দিতে হবে। সুতরাং এর পরবর্তী হল, এ জগতের সামগ্রীসমূহ বা এমনকী এর অধিকার, আলো এবং সৌন্দর্যকে আমাদের লক্ষ্যবস্তু করা থেকে বিরত হতে হবে; এগুলি ছাড়িয়ে আমাদের যেতেই হবে এক পরম সত্, এক বিশ্বাতীত পরম সত্য, জ্যোতি এবং সৌন্দর্যের কাছে, যে অবস্থায় যাকে আমরা অশুভ বলে থাকি তার বিরুদ্ধ রূপগুলি উধাও হয়ে যায়। কিন্তু তবুও, এই জগতে থেকে, কেবলমাত্র এই জগতেরই একটা-কিছুর মাধ্যমে আমরা একে ছাড়িয়ে যেতে পারি; এর রূপগুলির মধ্য দিয়েই আমাদেরকে সেই পরমকে খুঁজে পেতে হবে। সুতরাং সেগুলি আমরা খুঁটিয়ে দেখি, এবং উপলব্ধি করি যে প্রথমে আসে /মন, প্রাণ, বাক্ এবং বোধের এই রূপগুলি, তাদের সবগুলিই কতকগুলি রূপ আর ত্রুটিপূর্ণ অভিভাবন, এবং তারপর তাদের পিছনে রয়েছে বিশ্ব তত্ত্বগুলি যার মাধ্যমে সেই পরম এক কাজ করেন। এই বিশ্ব তত্ত্বগুলির দিকেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে এবং তাদের ফেরাতে হবে জগতে তাদের সাধারণ লক্ষ্য এবং গতিপথ থেকে তাদের আপন এক

দেবতা, পরম প্রভু, ব্রহ্মের মধ্যে তাদের আপন পরম লক্ষ্য এবং অনপেক্ষ গতিপথ খুঁজে নিতে; সাধারণ মনের ক্রিয়াবলী থেকে দূরে সরে থাকতে তাদের বাধ্য করতে হবে এবং আবিষ্কার করতে হবে অতিচেতন মন, সাধারণ বাক্ এবং বোধের ক্রিয়াবলী পরিত্যাগ করে খুঁজে নিতে হবে অতিমানসিক অনুভূতি এবং মূল শব্দ, পরিত্যাগ করতে হবে পার্থিব জীবনের প্রাতিভাসিক কর্মাবলী এবং আবিষ্কার করতে হবে বিশ্বাতীত জীবন।

CWSA 18: 93-94

আমাকে তুমি বিদ্ধ করতে পারবে না, কারন আমি অবধ্য, অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য, অদহনীয়, অনড়। আমার পরিধেয় এই অন্নকোষ বা বহুবিবর্ধিত প্রটোপ্লাজম, আমার এই পোশাক তুমি ছিঁড়তেই পারবে না — আমি তাই যা আগে ছিলাম। এমনকী তোমার উপর আমার রাগও হবে না, কারণ কে একজন শিশুর উপর রাগ করে নিজেকে অস্থির করে তুলবে, যেহেতু শিশুটি খেলার ছলে বা ছোট্ট শিশুসুলভ রাগের বশে আমার পোশাকটি ছিঁড়ে দিয়েছে? হয়ত পোশাকটা আমার কাছে দামি ছিল এবং এত তাড়াতাড়ি এটিকে ত্যাগ করতাম না; পারলে, আমি সেক্ষেত্রে এটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব, এবং এমনকী রাগ না করে তোমাকে শাস্তি দেব যাতে তুমি আমার আর পোশাকগুলো ছিঁড়ে না ফেল; কিন্তু যদি আমি না পারি — বেশ, এটাতো একটা কাপড়ই শুধু ছিল, এবং অল্পকালমধ্যেই দোকান থেকে আরেকটা আনা যেত; না, আমি কি ইতিমধ্যেই কেনার টাকা দিইনি? হে বিচারক আমার, আপনি যিনি আসনে বসে ঘোষণা করেছেন যে মৃত্যু না হওয়া অবধি আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, কেননা কয়েক হাজার অভুক্ত মানুষকে রুটির জোগান দিয়ে, নিজেদের সুখের জন্য আমার দেশের ক্রীতদাস করে রাখা মানুষদের সাহায করে, আমি বোধ হয় আপনাদের আইন ভঙ্গ করেছি — আমাকে আপনি ফাঁসিতে ঝোলাবেন? আপনি যখন অন্তরীক্ষ থেকে সূর্যকে নড়াতে পারবেন বা আকাশকে জামাকাপড়ের মত গুটিয়ে রাখতে পারবেন, তখন আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া হবে আমাকে ফাঁসি দেওয়ার। কে বা কী যাকে আপনার মনে হয় ফাঁসিতে ঝুলে মরবে? এক ঝাঁক অণুজীব, তার বেশি কিছু নয়। এই বাইরের আপনি এবং আমি রঙ্গমঞ্চে শুধুই দু'টি মুখোশ। বিচারক নামে এক মুখোশ, আপনি আপনার ভূমিকায় অভিনয় করেন; আমি অভিনয় করেছি আমার ভূমিকায়। হে প্রাচীন যোগের সন্তান, সকল বস্তুর মধ্যে তুমি নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি কর; কিছুতে ভয় পেওয়া নয়, কোন কিছুই ঘৃণা কর না: কাউকে দেখে আতঙ্কিত হবে, কাউকে ঘৃণা করবে না, বরং শক্তি আর সাহস নিয়ে নিজের ভূমিকা পালন কর; তখনই সত্যকারের তুমি যা, তুমি তাই হবে, তোমার বিজয়ের মধ্যে ভগবান, তোমার পরাজয়ের মধ্যে ভগবান, তোমার মৃত্যু এবং যন্ত্রণার মধ্যেই ভগবান, —- ভগবান, যিনি পরাজিত হবেন না এবং যাঁর মৃত্যু হতে পারে না। ভগবান কি কিছুতে ভয় পাবেন? তিনি কি

হতাশ .হয়ে পড়বেন? তিনি কি কেঁপে উঠবেন আর ঝাঁকুনি খাবেন? না, যে পতঙ্গগুলো দেহ আর মস্তিষ্ক তৈরি করে, সেগুলিই খায় ঝাঁকুনি আর কাঁপতে থাকে; তাদের মধ্যে বসা তুমি শান্ত চোখে দেখতে থাক তাদের যন্ত্রণা আর আতঙ্ক; কারণ তারা শুধু ছায়া যারা স্বপ্নে নজিদেরকে দেখে একটা সত্য হিসাবে। সকল প্রাণীর মধ্যে সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি কর, সেই পরম পুরুষের মধ্যে সকল প্রাণীকে উপলব্ধি কর; তারপর শেষ পর্যন্ত আতঙ্ক আতঙ্কিত হয়ে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে য়াবে, যন্ত্রণা তোমাকে স্পর্শ করবে না, পাছে তোমার স্পর্শ দ্বারা এ নিজে নির্যাতিত হয়, মৃত্যু তোমার কাছে আসতে সাহস করবে না, পাছে তাকে বধ করা হয়। CWSA 17: 144-45

অমরত্ব সম্পর্কে বলতে হলে, শরীরের প্রতি আসক্তি থাকলে এটা আসতে পারবে না,— কারণ একমাত্র শরীরের কাছে অজ্ঞাত নিজের অমর্ত্য অংশের মধ্যে বাস করে ও এর চেতনাকে নামিয়ে এনে এবং কোষগুলির মধ্যে ঢুকতে বাধ্য করলেই এটা আসতে পারে। আমি অবশ্য যৌগিক উপায়ের কথা বলছি। এখন বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেন যে (অন্তত তত্ত্বগতভাবে) শারীরিক উপায়ে মৃত্যুকে জয় করার উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু তার অর্থ হবে কেবলমাত্র বর্তমান শরীরে বর্তমান চেতনাকে দীর্ধায়িত করা। চেতনার রূপান্তর না ঘটলে এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াবলির পরিবর্তন না ঘটালে এতে লাভ হবে খুব সামান্য।

CWSA 28: 314

..... শুরুতে, আমি যখন অমরত্বের চেতনা পেতে শুরু করেছিলাম, এবং অমরত্বের এই সত্য চেতনা এবং এ সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে (যা সম্পূর্ণ আলাদা) এক জায়গায় করলাম, এত স্পষ্ট দেখলাম যে, একজন মানুষ (এমনকী একেবারে সাধারণ একজন মানুষ, যার নিজের ভিতরে সমষ্টিবোধ নয় — যেমন একজন লেখক, বা একজন দার্শনিক, বা দেশনায়ক) যখন তার কল্পনার মাধ্যমে নিজেকে, যাকে সে "অমরত্ব" (অর্থাৎ এক অনির্দিষ্ট সময়কাল) বলে তার মধ্যে অভিক্ষিপ্ত করে, সে শুধু একা নিজেকে নয় , বরং অবশযম্ভাবীরূপে এবং সর্বদাই তার সঙ্গে যা অভিক্ষিপ্ত হচ্ছে তা বল বস্তুরাজির একটা সম্পূর্ণ পিণ্ড, একটা সমষ্টি বা সম্পূর্ণতা, যা তার বর্তমান অস্তিত্বের জীবণ এবং চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে। এরপর আমি বেশ কিছু মানুষের উপর এই পরীক্ষাটা করি; তাদের আমি বললাম, 'মাফ করবে, কিন্তু ধরা যাক যে একটা বিশেষ শিক্ষা বা একটা বিশেষ করুণার বশে অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে তুমি

অনির্দিষ্ট কালের জন্য বেঁচে রইলে। খুব সম্ভবত তোমার এই অনিশ্চিত ভবিষ্যত পরিব্যপ্ত হয়ে থাকবে তোমার জীবনের নানান ঘটনা, নিজেকে ঘিরে তুমি গড়ে তুলেছ এই যে সংগঠন তা তৈরি হয়েছে মানুষ, নানান সম্পর্ক, নানান কার্যকলাপ, কমবেশি জীবন্ত বা অচেতন পদার্থের এক সমগ্র সম্ভার নিয়ে।

শ্রীমা: জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন, নভেম্বর ১৫, ১৯৬০

আর এক রকমে জয় করা যায় মৃত্যুভয়। তবে তা এত অল্প লোকের সামর্থ্যের মধ্যে যে এখানে শুধু তথ্য হিসেবে উল্লেখ করা গেল মাত্র। তা হল জীবিত থেকেই মৃত্যুর রাজত্বে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে প্রবেশ করা ; এবং সেখান থেকে ফিরে আসা এই স্থূল শরীরে, ফিরে এসে পূর্ণজ্ঞানে জড় জীবন যাপন করা। কিন্তু তার জন্য হতে হয় সাধক।
শ্রীমা

শ্রীমায়ের রচনা : ১২ : ৭৩

অমর দিব্যায়িত দেহের সম্ভাবনা

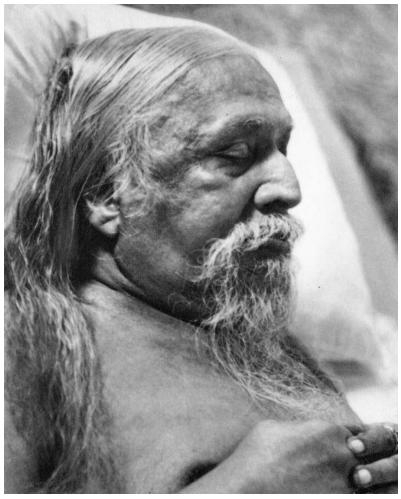

সবই এখানে বৈপরীত্যের রহস্য:

অন্ধকার হল আলোকের আত্মগোপন-কুহক,

দুঃখ নিভৃত এক উল্লাসের করুণ মুখোশ,

মৃত্যু হল চিরন্তন জীবনের বাহন এক।

মৃত্যু চলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পথে,

শরীরের আরম্ভের অস্পষ্টমূর্তি দর্শক শুধু

আর শেষ বিচার সে মানুষের ব্যর্থ কর্মাবলীর,

কিন্তু অন্য অর্থ এক তার দ্বিমুখী রহস্যের:

মৃত্যু হল সোপানধারা, দুয়ার এক, স্খলিত পদক্ষেপ

অন্তঃপুরুষ আত্মবলি যজ্ঞ তার করে চলে জন্ম হতে জন্মান্তরে,

ধূষর পরাজয় এক গর্ভে ধারণ করে অন্তিম বিজয়,

হল সে কশাঘাত, যেন ধেয়ে নিয়ে চলে আমাদের মৃত্যুহীন পদে।

নিশ্চেতন জগৎ হল চিন্ময়ের স্বকৃত আবাস,

চিরন্তন রাত্রি ছায়া চিরন্তন দিনের।

রাত্রি আমাদের আরম্ভ নয়, নয় আমাদের পরিণতি;

কৃষ্ণমাতা তিনি যাঁর গর্ভে ছিলাম আমরা লুকিয়ে

নির্বিঘ্নে, ত্রস্তে জেগে উঠতে তিনি দেননি আমাদের বিশ্ববেদনার মাঝে।

তাঁর কাছে আমরা এসেছিলাম লোকোত্তর জ্যেতি হতে,

জ্যেতি হতে আমাদের জীবন, জ্যেতির অভিমুখে চলি আমরা।

"সাবিত্রী" দশম পর্ব, প্রথম সর্গ, পৃষ্ঠা-731.

অমরত্ব মৃত্যুহীন অবস্থা নয়

অমরত্ব ও মৃত্যুহীন জীবনের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ এর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন সাবিত্রীতে।

মৃত্যুহীন জীবন হল তাই যা ভবিষ্যতে মানুষের পার্থিব শরীর সম্পর্কে মনে মনে কল্পনা করা যেতে পারে: এ হল অবিরাম পুনর্জন্ম। আবার পিছনদিকে উল্টে পড়ার পরিবর্তে এবং নমনীয়তার অভাবে ভেঙ্গে পড়া ও বিশ্ব গতির সঙ্গে মানিয়ে চলার অক্ষমতার দরুণ, শরীরটার, বলা যায়,'ভবিষ্যতে গিয়ে ' নাশ হয়।

এই একটা উপাদানই স্থায়ী হয়ে থেকে যায়; কারণ প্রতিটি পরমাণুর ধরন, উপাদানগুলির আভ্যন্তরীণ সংগঠন আলাদা, এটিই তাদের সারবস্তুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সুতরাং সম্ভবত একইভাবে, প্রতিটি ব্যক্তির তার দেহের কোষগুলি সংগঠিত করার একটা আলাদা, বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে, এবং এই বিশেষ পদ্ধতিটি সমস্ত বাহ্যিক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী হয়ে থেকে যায়। বাকি সবেরই নাশ হয় এবং আবার নতুন করে হয়, কিন্তু নাশ পিছু ফিরে মৃত্যুর মধ্যে বিলুপ্ত হবার পরিবর্তে সামনে নতুনের দিকে ঠেলে দিয়ে এবং এক নিরন্তর আস্পৃহা নিয়ে নতুন করে তৈরি করা সেই দিব্য সত্যের ক্রমবর্ধিষ্ণু গতি অনুসরণের জন্যে।

কিন্ত তার জন্যে শরীরকে — শারীর চেতনাকে — প্রথমে শিখতে হবে নিজেকে বিকশিত করতে। এটি অপরিহার্য, কারণ অন্যথায় অতিমানস আলোকের চাপে সমস্ত কোষগুলি হয়ে দাঁড়াবে এক ধরনের ফুটন্ত পরিজের (Porridge) মত।

সাধারণত যা ঘটে তা হল, যখন দেহ এর আস্পৃহার সর্বোচ্চ তীব্রতায় বা প্রেমজনিত পরমানন্দে পৌঁছে যায়, এ একে ধরে রাখতে অসমর্থ হয়। এটি একঘেয়ে, গতিহীন হয়ে পড়ে।পরিস্থিতি শান্ত ও স্থিতিশীল হয় — এক নতুন স্পন্দন নিয়ে তুমি সমৃদ্ধ হও কিন্তু তারপর সবকিছু আবার তার নিজের গতিতে চলতে শুরু করে। সুতরাং তোমার নিজেকে প্রসারিত করতে হবে যাতে তুমি আতিমানসিক শক্তির তীব্রতা অবিচলিতভাবে সহ্য করতে শিখতে পার, সর্বদা সামনে এগিয়ে যেতে পার, সদাসর্বদা দিব্য সত্যের ঊর্ধ্ব গতির সঙ্গে, পিছিয়ে পড়ে শরীরটি জরাগ্রস্ত না করে।

শ্রীমা: জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন, নভেম্বর ২৫, ১৯৫৯

দেহের সীমাবদ্ধতা

মানুষের যদি মৃত্যু না হত, তাহলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটা তো অকেজো হয়ে পড়ত, না কি ?

... মানুষের মরবার কোনই দরকার হত না, যদি তার দেহটার ক্ষয় না হত। তার দেহটার ক্ষয় হয়, সেটা অকেজো হয়ে যায় বলেই মানুষ মরে যায়। যাতে তারা না মরে, সে জন্যে চাই তাদের দেহটা যেন অকেজো হয়ে না পড়ে। এ হল ঠিক উল্টো। দেহটা ভেঙে পড়ে, তার ক্ষয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত অবনতির চরমে গিয়ে পৌঁছয় বলেই মৃত্যুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেহ যদি ভিতরকার সত্তার প্রগতির ধারা অনুসরণ করে চলত, যদি চৈত্যপুরুষের মতন তার সেই একই উন্নতির এবং ক্রমসিদ্ধির অনুভূতি থাকত, তাহলে তার মরবার কোন দরকারই হত না। একটা বছর ঘুরে আর একটা বছর আসার মানেই যে তার সঙ্গে খানিকটা ক্ষয়ও আসবে এমন অনিবার্য কিছু নেই। ও কেবল প্রকৃতির অভ্যাস মাত্র, ঠিক যা বর্তমানে ঘটে চলেছে তারই অভ্যাসের ফল, আর ঠিক এইটাই হল মৃত্যুর কারণ। বরং নিশ্চয়ই আশা করা যেতে পারে যে পূর্ণতা লাভের দিকে এই যে ক্রমগতি, যেটা তার জীবনের একেবারে গোড়াতেই রয়েছে, সেটা আর এক ভাবে সার্থকতা লাভ করে চলতে পারে। আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি যে, সব দিক দিয়ে অপ্রতিহতভাবে পরিণতি লাভের কথা মানুষ আশাই করে না, কারণ তাহলে তাদের ঘরবাড়িগুলোকে কিছুকাল পরেই আবার বদলে আরো বড় করে তৈরী করতে হবে। কিন্তু এই ক্রমবৃদ্ধি, দৈর্ঘের দিকে না হয়ে আরো পরিপূর্ণতার দিকে হতে পারে, সেটা হবে দেহের পূর্ণতা। মানব দেহের যত কিছু অপরিপূর্ণতা আছে সে সব ক্রমে ক্রমে সংশোধন করা যেতে পারে, সকল দুর্বলতাকে সবলতার দ্বারা পূর্ণ করে তোলা যেতে পারে, সকল অসামর্থ্যকে সুদক্ষতায় পরিণত করা যেতে পারে। এমনটা না হবার তো কোনই কারণ নেই। একমাত্র কারণ, তোমরা এভাবে চিন্তাই কর না, আর তার কারণ হল, চিরকাল তোমাদের অভ্যাসই হচ্ছে সব কিছু অন্যভাবে দেখা। কিন্তু এমন কোন কারণ নেই যার দরুন দেহের পরিবর্তন এইভাবে ঘটতে না পারে।

শ্রীমায়ের রচনা : ৫ : ১১২-১৩

প্রকৃত অমরত্ব

... বহুকাল আগে লোকেরা এখানে আসত এই ভেবে যে অমর হতে হলে আশ্রমিক হওয়াই যথেষ্ট। আর অমরত্ব লাভের জন্য তাদের আস্পৃহাও ছিল প্রচুর। স্বভাবতই এরা ছিল বৃদ্ধের দল

যারা দেখত তাদের সামনের পথটি যথেষ্ট দীর্ঘ নয় --- তারা চাইত অনির্দিষ্ট কাল ধরে সেটাকে বাড়িয়ে যেতে --- কারণ অমর বলতে মানুষ এটাই বোঝে --- তারা যা তা-ই অনির্দিষ্ট কাল ধরে থেকে যাওয়া। সুতরাং, প্রথম যে আমার কাছে এই মন্তব্য করেছিল তাকে বলেছি : আমি জানি না সবাই অমর হতে পারবে কি না --- সম্ভবত নয় --- , কিন্তু যাদের অমর হবার ক্ষমতা রয়েছে তাদের ভিতরেও কজন এর জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত ? কারণ বহু জিনিসই ত্যাগ করতে হবে আর এতটা পরিমাণে যে হয়তো মাঝপথে তারা বলবে : " আঃ, না, এর মূল্য অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে।" আমার মনে পড়ছে এক চিত্রকরের কথা যার সঙ্গে অমরত্বের সম্ভাবনা নিয়ে কথা হয়েছে। সে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, নতুন জগৎটি কেমন হবে ? উদাহরণ হিসেবে তাকে বলেছিলাম, সব কিছুর থাকবে নিজস্ব ঔজ্জল্য, আর পৃথিবীর উপর এই ধরনের সূর্যের থেকে আসা প্রতিবিম্বিত আলো আর থাকবে না। আমি যখন কথা বলছিলাম লক্ষ্য করলাম তার মুখটি লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, ক্রমেই হয়ে উঠছিল বেশি গম্ভীর, তারপর সে আমায় বললে : কিন্তু তাহলে ছায়া ছাড়া কি করে ছবি আঁকা যাবে --- যা সব জিনিসের আলোকে স্পষ্ট করে তোলে ? তাকে বললাম, " তুমি সমস্যা সমাধানের ঠিক উপায়টি দিয়েছ।"

… যে সব জিনিস সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সবচেয়ে কঠিন সেটা হচ্ছে নিজের আমিত্বকে ছাড়া, কারণ আমিত্বকে ছাড়া অর্থ, যে প্রস্তুত নয় তার পক্ষে, মরে যাওয়া, শারীরিক মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশি এটা কারণ তাদের পক্ষে আমিত্বের মৃত্যু অবিকল এরকম নয়। কিন্তু এর আরম্ভটা এই রকম একটা ভাব সৃষ্টি করে। অমর হতে হলে সমস্ত রকম সংকীর্ণতা ত্যাগ করতে হবে --- আর আমিত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংকীর্ণতা, সুতরাং, 'আমি' যদি অমর না হই --- তবে তার দরকার কি ?

দৈহিক রূপান্তর

সুতরাং কেউ যদি তার দেহকে রূপান্তরিত করার সংকল্প করে থাকে, তাহলে তাকে প্রয়োজন মতো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, তিন-শ, পাঁচ-শ, হাজার যত বছরই লাগুক, তাতেও কিছু এসে যায় না। আমার তো মনে হয়, কম পক্ষে তিন-শ বছর লাগবেই। সত্যি বলতে কি, দেহকোষের রূপান্তর সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তা থেকে আমার বিশ্বাস, তিন-শ বছর বলতে সবচেয়ে কম বলা হয়েছে।

… কি ভাবে তোমার দেহটা গড়ে উঠেছে --- নয় কি ? তোমার দেহটি তৈরী হয়েছে অবিকল পশুর দেহের মতোই, দেহগত যত যন্ত্র এবং সে সবের ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিয়েই তা গড়ে উঠেছে। তুমি সেখানে সম্পূর্ণ হাত পা বাঁধা। তোমার হৃৎযন্ত্রটি যদি চোখের এক পলকের জন্যেও থেমে

যায়, তাহলেই তুমি গেলে, আর তখনই সব শেষ। দেহযন্ত্রের মধ্যে সব কিছুই আপনা আপনিই কাজ করে চলেছে, তোমার নিজের ইচ্ছার কোনই হাত নেই সেখানে (অবশ্য তার দরুন তুমিই বেঁচে গেছ। নইলে তোমাকে যদি তোমার দেহের যন্ত্রগুলির কাজকর্মের তদারক করতে হোত, তাহলে বহুকাল আগেই তাদের কল বিগড়ে বসে থাকত)। সমস্ত কিছুই দেহের মধ্যে রয়েছে, আর সে সবেরই দরকার আছে, কারণ ওইসব ব্যবস্থা অনুসারেই দেহটি গড়ে উঠেছে। এদের কোন একটিকে বাদ দিয়ে তোমার চলার উপায় নেই, অন্তত একেবারে বাদ দিতেই পারো না। সে জায়গায় তার অনুরূপ একটা কিছু তোমার মধ্যে থাকা চাই।

দেহের যে রূপান্তরের বা আমূল পরিবর্তনের কথা বলছি, তার মানে হল, দেহগত যন্ত্রগুলির এই সমস্ত স্থূল ব্যবস্থার বদলে, বিভিন্ন রকমের স্পন্দন অনুসারে, একই মূলশক্তিকে বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে প্রতিটি দেহযন্ত্রের বদলে বিশেষ এক একটি সচেতন শক্তির কেন্দ্র থাকবে। সে কেন্দ্রগুলি এক সচেতন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা গতিবেগ লাভ করবে এবং ঊর্দ্ধের রাজ্যগুলি থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে। পাকস্থলি বলে আর কিছু থাকবে না, তেমনি হৃৎযন্ত্রও থাকবে না, রক্তের চলাচলও থাকবে না, ফুসফসও নয়..... এ সবের কোন কিছুই থাকবে না। এদের বদলে থাকবে, স্পন্দন-তরঙ্গের একটি সমষ্টি যেগুলিই হবে দেহ যন্ত্রগুলির প্রতিনিধি। কারণ আমাদের এই দেহ যন্ত্রগুলি আসলে যত শক্তিকেন্দ্রের স্থূল প্রতিনিধি, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা যথার্থই মূল সত্যবস্তুটি নয়। কয়েকটি বিশেষ অবস্থা আছে বলে আমাদের দেহ যন্ত্রগুলির কাছ থেকে সেই শক্তি একটা বিশেষ আকৃতি অথবা একটা বিশেষ সমর্থন পায়। তাই দেহের যখন রূপান্তর হবে তখন শক্তির এই সব সত্যিকারের কেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়েই সে কাজ করবে।পশুদেহের মধ্যে তাদের যে সব প্রতিনিধি এতকাল ধরে গড়ে উঠেছে , সে সবের মাধ্যমে আর কাজ করবে না। তাই রূপান্তরিত দেহ লাভ করবার আগে, প্রথমেই তোমাকে জানতে হবে বিশ্ব-শক্তির মধ্যে তোমার হৃৎযন্ত্রটি কিসের প্রতিনিধি। তেমনি জানতে হবে, রক্ত-সংবহন যন্ত্র, তোমার পাকস্থলী, তোমার মস্তিষ্ক প্রভৃতি কোন্ কোন্ শক্তির প্রতিনিধি। তোমার প্রথম কাজই হল এইগুলির সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। তার পরের কাজ হল ঐসব যন্ত্র যে শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে, সেই শক্তির নিজস্ব স্পন্দনগুলিকে আয়ত্বের মধ্যে আনা। এর পরে ধীরে ধীরে এই শক্তিগুলিকে নিজের দেহের মধ্যে এনে একত্রিত করা, আর তারপর প্রত্যেকটি দেহযন্ত্রের বদলে এক একটি সচেতন শক্তি-কেন্দ্র স্থাপন করা, যেগুলি এইসব প্রতিনিধি যন্ত্রের ক্রিয়ার বদলে , সেই সেই শক্তির ক্রিয়ার দ্বারাই পরিচালিত হবে..... তুমি বুঝি মনে কর, মাত্র তিন-শ বছরের মধ্যেই এত সব কান্ড শেষ হবে ? আমার বিশ্বাস তার চেয়েও ঢের বেশী সময় লাগবে, তখন নতুন কলেবরটি উপযুক্ত সব গুণের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে।

এ পর্যন্ত আমরা যেমনটা জেনে আসছি, ঠিক তাই আর হবে না, হবে তার চেয়ে মহত্তর, বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিক ভাবেই তা হবে এমন একটি নমনীয় কলেবর, যার সম্বন্ধে মানুষ কল্পনা করে আসছে। এখন যেমন তোমার ভাবাবেগের তারতম্য অনুসারে তোমার মুখের চেহারা বদলায়, তেমনি তোমার দেহ দিয়ে যে বস্তু প্রকাশ করতে চাইবে, সেটির তারতম্য অনুসারে তোমার দেহটিও বদলাতে থাকবে (যদিও দেহের বাহ্য আকারের কোন পরিবর্তন হবে না।) নতুন দেহটি খুবই ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উঠতে পারে, আর খুবই উন্নত, খুবই উজ্জ্বল, ধীর স্থির, সম্পূর্ণ নমনীয় হবে এবং অদ্‌ভূতভাবে পরিবর্তন-উন্মুখ এবং ইচ্ছেমতো হাল্কা হতে পারবে..... স্বপ্নে কি কখনো, মাটিতে জোরে পায়ের এক চাপ দিয়েই শূন্যে উঠে গিয়ে উড়ে চলতে লাগলে, এমনটা হয় নি ? স্বপ্নলোকে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো যায়। কাঁধের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এদিক দিয়ে উড়ে গেলে, তারপর আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওদিকে উড়ে চলে গেলে, এইভাবে যেখানে খুশি সর্বত্রই অত্যন্ত সহজে যেতে পারো। তারপর যখন বেশ খানিকটা বেড়ানো হয়েছে বোধ হবে তখন ফিরে আবার তোমার দেহের মধ্যে এসে প্রবেশ কর। স্বপ্নের বদলে এখন এই স্থূল দেহে উপস্থিত থেকেই তা করতে পারা সম্ভব হবে। তেমনি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গেও জড়িত কতকগুলি জিনিস করা সম্ভব হবে। কিন্তু তখন ফুসফুস যন্ত্রটি আর থাকবে না। প্রতীক গতিবৃত্তির পিছনে যে সত্যিকারের গতিবৃত্তি রয়েছে, তারই অভিব্যক্তি হব, আর সেটাই দেহটিকে ভার-শূন্য হতে পারার এই সামর্থ্য দান করবে। তখন থেকে তুমি আর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীনে থাকবে না, তাকে টপকে চলে যাবে। আর এই ভাবে পরপর সব বদলাতে থাকবে।

কল্পনার কোন অন্ত নেই। সে চায় ইচ্ছেমতো জ্যোতির্ময় হতে, ইচ্ছেমতো স্বচ্ছ হতে। অবশ্যই দেহে তখন আর কঙ্কালেরও কোন প্রয়োজন হবে না। এখনকার মতো কঙ্কালে ঢাকা হৃৎপিন্ড, যকৃৎ, অন্ত্রনালীর উপর চর্মাবৃত দেহ আর থাকবে না। এ দেহ তখন হবে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, হবে ঘণীভূত শক্তি, যা পরিচালিত হবে ইচ্ছার আজ্ঞাধীনে। তার মানে নয় যে, দেহের কোন নির্দিষ্ট আকার থাকবে না, তাকে চিনতে পারা যাবে না। আকার দেহের থাকব, তবে এখনকার মতো স্থূল, কঠিন, ক্ষুদ্র সব পদার্থের দ্বারা না হয়ে, তা গড়ে উঠবে নানা গুণের দ্বারা। হয়তো বলা চলে, দেহটি হবে কার্যকর এবং আশু ব্যবহারের উপযোগী, অর্থাৎ হবে নমনীয়, গতিশীল এবং ইচ্ছামাতার ভারশূন্য, এখনকার মতো অতি স্থূল আকারের কাঠিন্যের ঠিক বিপরীত।

শ্রীমায়ের রচনা : ৫ : ৫৯-৬০

অমরত্ব — অতিমানসিকীকরণের ফল

অতিমানসিকীকরণের সম্ভাব্য ফলগুলির একটি হল অমরত্ব, কিন্তু এটি বাধ্যতামূলেক ফল নয় এবং এর অর্থ এই নয় যে জীবন যেমন আছে তা চিরস্থায়ী হবে বা অনির্দিষ্টকালের জন্য দীর্ঘায়িত হবে। অনেকে এটাই ভাবে যে এমনটাই হবে, তাদের সমস্ত মানুষি বাসনা নিয়ে তারা যেমন আছে তেমনিই থেকে যাবে, এবং একমাত্র পার্থক্য যা হবি যে তাদের বাসনাগুলি তারা অবিরাম পরিতৃপ্ত করে চলবে; কিন্তু এই রকম এক অমরত্ব সম্পূর্ণ মূল্যহীন এবং বেশি সময় লাগবে না লোকের (এই অমরত্ব নিয়ে) ক্লান্ত হয়ে পড়তে। ভগবানের মধ্যে বাস এবং ভাগবত চেতনার মধ্যে থাকাটাই অমরত্ব এবং দেহটিকেও দেবতুল্য করে তোলায় সক্ষম হতে এবং একে দিব্য কর্ম এবং দিব্য জীবনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্র করে তোলায় হবে শুধু এর জড় প্রকাশ।

CWSA 28: 314

চেতনার রূপান্তর

চেতনার রূপান্তরটাই জরুরি এবং এ ভিন্ন দেহের সিদ্ধি আসতে পারে না! দেহ যেমন আছে, মৃত্যু, ব্যাধি, ক্ষয়, বেদনা,অচেতনা, এবং অজ্ঞানতাজনিত অন্যান্য পরিণামের বশ দেহ যেমন আছে, যদি তেমনই থাকে, তা'হলে পরিপূর্ণ অতিমানস রূপান্তর সম্ভব নয়। এগুলিকে যদি থাকতেই হয় তাহলে অতিমানসের অবতরণের বড়ো একটা প্রয়োজন নেই — কারণ চেতনার পরিবর্তন ভগবানের সঙ্গে যে মানসিক-আধ্যাত্মিক মিলন ঘটাবে, তার জন্য অধিমানসই যথেষ্ট, এমনকী উচ্চতর মানসই যথেষ্ট। অতিমানস অবতরণের প্রয়োজন মন, প্রাণ এবং দেহে পরম সত্যের ক্রিয়াক্ষম কর্মের জন্য। চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে এর দ্বারা সূচিত হবে অচেতনার অন্তর্ধান; দেহ আর ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন থাকবে না। তার অর্থ হবে, সাধারণ প্রক্রিয়াগুলি যার জন্যে মৃত্যু ঘটে, দেহ তার অধীনে থাকবে না। দেহের রূপান্তর ঘটাতে হলে, সেটি হতে হবে অন্তঃস্থ-নিবাসীর ইচ্ছা মতন। এটাই (বাধ্যতামূলক ৩০০০ বৎসরের জীবন নয়, কারণ সেটিও একটা বন্ধন হয়ে দাঁড়াবে) হবে দেহের অমরত্বের সারকথা। তবুও, যদি কেউ ১০০০ বছর বা তারও বেশিদিন বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে সাধকের পূর্ণ সিদ্ধি হয়েছে ধরে নিলে, এটা অসম্ভব হওয়া উচিত নয়।

CWSA 28: 19

বিবর্তনে মৃত্যুর আবশ্যকতা রয়েছে, কারণ শরীর আর উন্নতি করতে পারে না — চেতনার প্রগতি বা বিবর্তনের যন্ত্র হিসাবে এ আর যথেষ্ট নয় — একে এর দেহ যন্ত্রটিকে বদলাতে হবে এবং নতুন একটা পেতে হবে। যদি এমন একটা-কিছু এর দেহের ভিতর নিয়ে আসা যায় যাতে আত্মা একটা নমনীয় যন্ত্রের অধিকারী হতে পারে, একমাত্র তা'হলেই মৃত্যু আর আবশ্যকীয় নয়। অতিমানস রূপান্তর সম্পূর্ণ হলে সেটিই হওয়া উচিত।

CWSA 28: 310

মৃত্যুকে জয়

মৃত্যুকে জয়ের সম্পর্কে বলতে হলে, এটি শুধু অতিমানসিকীকরণের আনুষঙ্গিক ফলাফলগুলির একটি —- এবং অতিমানস অবতরণ সম্পর্কে আমার অভিমত থেকে আমি যে সরে এসেছি সেটি আমার অবগতিতে নেই। কিন্তু আমি কখনই বলিনি বা ভাবিনি যে অতিমানসের অবতরণ সবাইকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অমর করে দেবে। অতিমানস অবতরণ শুধু যে কারোরই জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থা তৈরি করে দিতে পারে যদি সে তখন এর কাছে নিজেকে খুলে ধরতে পারে বা তারপরে অতিমানস চেতনা ও তার ফলগুলি পেয়ে। কিন্তু এতে সাধনার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না। যদি তাই হত, এর যুক্তিসম্মত পরিণতি এই হত যে, সমস্ত পৃথিবী, মানুষ, কুকুর, এবং পোকামাকড হঠাৎ জেগে উঠে দেখত তারা সব অতিমানসিক হয়ে গেছে। আশ্রম বা যোগের কোন প্রয়োজন পড়ত না।

গুরুত্বপূর্ণ হল চেতনার অতিমানসিক রূপান্তর — মৃত্যুকে জয় করার বিষয়টা গৌণ এবং, যেমন আমি বরাবর বলে এসেছি, এর সর্বশেষ শারীরিক পরিণতি, সবার প্রথম পরিণতি নয় বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও নয় — সমগ্রকে সম্পূর্ণ করতে একটা জিনিস যোগ করতে হবে, প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য এক জিনিস নয়। এটিকে প্রথমে এগিয়ে দেওয়াটা হল সমস্ত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বিপরীতমুখী করা — এর অর্থ হবে অন্বেষক সক্রিয় হয়েছিল কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের বশে নয়, পরন্তু জীবনের প্রতি প্রাণিক আসক্তির তাড়নায় বা শরীরের সুরক্ষার জন্য এক আত্মপর এবং ভীরু অন্বেষণে — এরকম একটা মনোভাব অতিমানসিক রূপান্তর আনতে পারে না।

দেহের অমরত্ব

অতিমানসিকীকরণ ভিন্ন দেহের অমরত্ব আসতে পারে না; যৌগিক শক্তিতে সে সম্ভাবনাটা রয়েছে এবং যোগীরা ২০০ বা ৩০০ বছর বা তারও বেশি দিন জীবিত থাকতে পারে, কিন্তু অতিমানস না হলে এর কোন প্রকৃত তত্ত্ব থাকা সম্ভব নয়।

এমনকী বিজ্ঞানও বিশ্বাস করে যে শারীরিক উপায়ে একদিন মৃত্যুকে জয় করা যেতে পারে এবং এর যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। অতিমানসিক শক্তির এটা না করার কোন কারণ নেই। শরীর (বাহ্যিক অবয়ব) টিকে থাকে না (অন্য অন্য স্তরে থাকতে পারে) কারণ আত্মার প্রগতি প্রকাশ করার জন্যে অবযবগুলির বিকশিত হয়ে ওঠার পক্ষে অত্যন্ত অনমনীয়। যদি তারা যথেষ্ট নমনীয় হয়ে সেটি করতে পারে, তাহলে তাদের টিকে থাকতে না পারার কোন কারণ নেই।

অমরত্বের ব্যাপারে, শরীরের প্রতি আসক্তি থাকলে এটা আসবে না, – কারণ একমাত্র শরীরের কাছে অজ্ঞাত নিজের অমর্ত্য অংশের মধ্যে বাস করে, এবং এর চেতনা ও শক্তিকে কোষগুলির মধ্যে নামিয়ে আনতে পারলে তবেই অমরত্ব আসতে পারে। আমি অবশ্য যৌগিক উপায়ের কথা বলি। বিজ্ঞানীরা এখন স্বীকার করেন যে (অন্তত তত্ত্বগতভাবে) মৃত্যুকে জয় করার শারীরিক উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু তার অর্থ হবে বর্তমান শরীরে বর্তমান চেতনাকে দীর্ঘায়িত করা। চেতনার রূপান্তর না হলে এবং বৃত্তিগুলির পরিবর্তন না হলে, এতে লাভ হবে খুব সামান্য।

CWSA 28: 314

অতিমানস দেহ

একদিন এই পৃথিবীতে যে অতিমানসিক দেহের সৃষ্টি হবে,, তার থাকবে চারটি প্রধান গুণ, --- লঘুভার, উপযোগিতা বা মানিয়ে চলার ক্ষমতা, সুনম্যতা ও জ্যোতির্ময়তা। মানুষের বাহ্য দেহটা যখন পুরোপুরি দিব্যদেহে পরিণত হবে, তখন তার বোধ হবে যেন সে সর্বদাই হাওয়ার উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে তখন ভারবোধ, তামসিক জড়তা বা অচেতনতা থাকবে না। তার উপযোগিতার বা নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতাও হবে অপরিসীম। যে কোন অবস্থাতেই সে পড়ুক না কেন, তার কাছ থেকে তখন যেটা আশা করা যাবে, সে তৎক্ষণাৎ তার চরম গুণপনার পরিচয় দেবে। কারণ সকল আলস্য, কুঁড়েমি, অক্ষমতা প্রভৃতি, যেগুলো সাধারণত জড়কে আত্মার উপর একটা প্রচন্ড ভারবোঝা করে

তোলে, সে সবকে তার পূর্ণাঙ্গ চেতনা একেবারে বর্জন করবে। যে কোন বিরোধী শক্তি দেহকে আক্রমণ করতে চাইবে, অতিমানসিক সুনম্যতা তাকে সে আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করবে। তার অর্থ এ নয় যে, দেহটি আক্রমণের বিরুদ্ধে একটা স্থূল রকমের গুরুভার বাধা দাঁড় করাবে। বরং সে নিজে এতখানি সুনম্য হবে যে, আক্রমণটার পথ করে দেবার জন্যে, সে নিজেকে মুছে দেবে, এবং তাতেই সেই বিরোধী শক্তিটা নিজে মুছে যাবে। এইভাবে দেহের পক্ষে ক্ষতিকর কিছুই ঘটতে পারবে না, এমন কি সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণের হাত থেকেও অক্ষত শরীরে অব্যাহতি লাভ করবে। অবশেষে দেহটি আলোকের সার পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে, তার প্রতিটি কোষ অতিমানসের মহিমা বিকীরণ করবে। সাধনায় যারা অনেকখানি এগিয়ে এই ঔজ্জ্বল্যকে দেখার মতো সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করেছে, কেবল যে তারাই দেখতে পাবে তা নয়, অতি সাধারণ লোকেরাও তা দেখতে পাবে। সকলের পক্ষেই তা হবে রূপান্তরের প্রত্যক্ষ এবং চিরস্থায়ী প্রমাণ। অতি বড় অবিশ্বাসীও তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে।

দেহের রূপান্তর হবে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম লাভ। অতীতের সকল প্রচলিত অভ্যাসকে তা সম্পূর্ণ বর্জন করবে। সত্যি সত্যিই আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বলতে বোঝায়, অনুক্ষণ আমাদের পুরোনো যত সম্বন্ধকে বর্জন করে চলা, পুরোনো ধরনের কাজকর্ম না করা, আমাদের অতীত জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সর্বদা বর্জন করা, যাতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে, প্রতিক্ষণে আমরা এক নতুন জীবন শুরু করতে পারব। কর্মের বন্ধনমুক্ত হওয়া বলতে একেই বোঝায়। এ হল আমাদের অতীতের সকল কর্মপ্রবাহের অবসান। আর একভাবে বললে, এ হল প্রকৃতির সকল অভ্যস্ত কার্যকলাপের, তাদের কারণগুলোর এবং ফলাফলের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করা। অতীতের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ যখন আমাদের চেতনাতে বিজয়মন্ডিত হয়ে প্রকাশ পাবে, তখন আমাদের সকল দোষত্রুটি, সব ভুল চাল, সকল বোকামি এবং আহাম্মকীতা, যেগুলো আমাদের স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে, জোঁকের মতন যেগুলো একেবারে আঁকড়ে ধরে আছে, আমাদের জীবনের সব রক্ত যেন শুষে নিতে চায়, --- সে সবই আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়বে। আমরা তখন মুক্তির শ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করব। এ মুক্তিলাভ কেবল মনের চিন্তার ব্যাপার নয়, এ হল প্রত্যক্ষ বাস্তব, সম্পূর্ণ কার্যকরী, একেবারে স্থূল ব্যাপার। সত্যিই আমরা তখন মুক্ত, কোন কিছুই আর আমাদের বাঁধতে পারে না, কোন কিছুই আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না, দায়িত্ব বোধের মোহ আর আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে না। আমরা যদি আমাদের অতীতকে নিষ্ক্রিয় করতে, বিলুপ্ত করতে চাই, অথবা চাই তার চেয়ে আরো বড় কিছু হতে, তাহলে কেবলমাত্র বিলাপ করে অথবা ওই ধরনের অন্য কিছু করে, তা করা যাবে না। পুরোনো অপরিবর্তিত অতীত

বলে কোনদিন যে কিছু ছিল, এ একেবারে আমাদের সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে। এমন এক জ্যোতির্ময় চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে যা সকল বাঁধনের দড়ি ছিঁড়ে ফেরতে পারে। পুনর্জন্ম বলতে বোঝায়, সবার আগে আমাদের চৈত্য-চেতনার মধ্যে প্রবেশ করা, যেখানে আমরা ভগবানের সঙ্গে একীভূত। সখানে আমরা কর্মের সকল প্রতিক্রিয়া থেকে অনন্তকালের মতো মুক্ত। কেউ যদি তার চৈত্যপুরুষের সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তাহলে এ অবস্থা লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু একবার আমাদের অন্তরে বিরাজমান আত্মার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে সচেতন হতে পারলে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। তখন প্রতিটি মুহূর্তেই এক নতুন জীবন, অতীত আর আমাদের আঁকড়ে ধরে থাকে না। আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের শেষ তুঙ্গ শিখর সম্বন্ধে তোমাদের যাতে একটা ধারণা হয়, সে জন্যে আমি বলি, তোমাদের তখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হবে, এই বিশ্ব প্রতি মুহূর্তে সত্যিই বিলুপ্ত হচ্ছে, আবার প্রতি মুহূর্তেই নতুন করে গড়ে উঠছে।

শ্রীমা

শ্রীমায়ের রচনা : ৩ : ১৮৬-৮৮

মৃত্যু বিনা অবস্থান্তর

দু'টির মধ্যে অবস্থান্তর সত্যিই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে একমাত্র দেহের — যাকে আমরা বলতে পারি "উন্নত স্থূল দেহ" — ভিতর অতিমানসীকৃত চেতনার প্রবেশের — সচেতন এবং ইচ্ছুক প্রবেশ — মাধ্যমে। অন্য কথায়, এখন যেমন আছে সেই মানুষি স্থূল দেহ, কিন্তু উন্নত; উদাহরণ হিসেবে, সত্যিকার শারীরিক প্রশিক্ষণ দ্বারা সৃষ্ট উন্নতি, এর বর্তমানের অতিরঞ্জিত রূপে নয়, পরন্তু এর প্রকৃত অর্থে। এটা এমন কিছু যা আমি মোটামুটি স্পষ্টভাবে দেখেছি; একটা বিবর্তনে (আজকাল শারীরিক প্রশিক্ষণের খুব দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, এমনকী শুরুর পর পঞ্চাশ বৎসরও হয়নি), বিবর্তনে ঐ শারীরিক প্রশিক্ষণে উন্নতি একটা হবে, অর্থাৎ, একটা কোমলতা, একটা ভারসাম্য, সহিষ্ণুতা, এবং এক সুসংগতি; অতিমানসীকৃত চেতনার জন্য এই চারটি গুণ — কোমলতা (নমনীয়তা), সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য, সহিষ্ণুতা, এবং দেহের সুসংগতি — একে আরও নমনীয় একটা যন্ত্র করে তুলবে।

সুতরাং অবস্থান্তর: ঐ ভাবে প্রস্তুত এক দেহের অতিমানসীকৃত চেতনার দ্বারা সচেতন আর ইচ্ছুক ব্যবহারে। দেহটিকে নিয়ে যেতে হবে এর উন্নতির শিখরে এবং কোষগুলির সদ্ব্যবহারে যাতে... হ্যাঁ, যাতে পরমা শক্তির সঙ্গে সচেতনে সংপৃক্ত হওয়া যায় (এই মুহূর্তে এখানে [মায়ের মধ্যে] যা করা হচ্ছে এবং এটাকে নিয়ে যেতে হবে এর সামর্থ্যের শেষ প্রান্তে। এবং

শরীরের মধ্যে যার বাস, শরীরকে যে উদ্দীপ্ত করে, সেই চেতনার যদি প্রয়োজনীয় গুণাবলী যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহলে রূপান্তরের সামর্থ্যের শেষ প্রান্তে গিয়ে চেতনার সেই দেহটিকে ব্যবহার করতে পারা উচিত, ফলে পচন ধরা কোষগুলির মৃত্যুর কারণে উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ ন্যূনতম হয় — কতটা পরিমাণে?.... সেটি সঠিকভাবে এখনও অজানা।

শ্রীঅরবিন্দ যাকে ইচ্ছা মত জীবনকে, অনির্দিষ্টকালের জন্য, দীর্ঘায়িত করা বলেছেন, তার সঙ্গে সেটি সংগতিপূর্ণ।

কিন্তু বর্তমানে ব্যাপারটি যে রকম, মনে হবে একটা পরিবর্তনকালীন সময় রয়েছে যেখানে চেতনাকে একটা দেহ পরিবর্তন করে, আরও ভালভাবে প্রস্তুত, আরেকটি দেহে ঢুকতে হবে — বাহ্যিকভাবে আরও ভাল প্রস্তুত, শারীরিকভাবে (ভিতরে নয়); "বাহ্যিকভাবে," আমি বোঝাতে চাচ্ছি, এই দেহে যেগুলি নেই, চার গুণাবলীর — যথেষ্ট পরিমাণে ও সম্পূর্ণতা নিয়ে যা অনুপস্থিত — উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত কিছু প্রবণতা। অর্থাৎ, ঐ চার গুণাবলীর মধ্যে থাকতে হবে নিখুঁত সঙ্গতি এবং থাকতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে যাতে রূপান্তরের কাজের ভার বহনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

শ্রীমা: জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন, নভেম্বর ১৫, ১৯৬০

নতুন দেহে স্থানান্তরণ

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি একটা নতুন দেহে "স্থানান্তরণের" কথা বলছ? সে ক্ষেত্রে তোমাকে একটা নতুন দেহে স্থানান্তরিত হতে হবে। কিন্তু স্থানান্তরণ (গুহ্য দৃষ্টিকোণ থেকে, সেটা একটা জানা জিনিস), জন্ম নিতে যাওয়া একটা দেহে স্থানান্তরণ নয়, পরন্তু ইতিমধ্যেই গঠিত একটা দেহে। এটা ঘটবে যে দেহটি বদল হবে অন্য দেহ'টির, গ্রহীতা দেহের সঙ্গে, তার চৈত্যিক ব্যক্তিসত্তার এক ধরণের ঐকাত্ম্যের মাধ্যমে — কিন্তু সেটা, চৈত্যিক ব্যক্তিসত্তাগুলির একীভূত হওয়া , এটা সম্ভব, (হাসতে হাসতে) পদ্ধতিটা আমার জানা আছে! কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন অহং এর বিলোপন — হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে প্রয়োজন অহং-এর বিলোপন; কিন্তু অতিমানসিকভাবাপন্ন ব্যষ্টিত্বতে (ব্যষ্টিত্ব শব্দটি কি আমি ব্যবহার করতে পারি? জানি না ... এটি "ব্যক্তিসত্তাও" নয়, বা "ব্যষ্টিত্বও" নয়) এর বিলোপনই যদি যথেষ্ট হয়, অতিমানসিকভাবাপন্ন সত্তায়, যদি অহং এর বিলোপসাধন হয়, সমাপ্ত হয়, তাহলে সেই সত্তাটি অন্য সত্তাটির ভিতরকার অহং এর উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত করার ক্ষমতা ধরে। এবং তারপর, সেই প্রশমনের মধ্য দিয়েই পুনর্জন্ম থেকে যে সংকোচনটা সর্বদাই হয়ে তাকে, সেটি বিলুপ্ত হবে —- ভয়ঙ্কর ব্যাপার সেটাই, দেখ'তো, একটা

নতুন সত্তার মধ্যে সংকোচনের ফলে নষ্ট সময়! এক দেহ থেকে অন্য দেহে সেই সচেতন অতিক্রমণের — ইচ্ছুক এবং সচেতন — সময়ে, যে সত্তাটির মধ্যে অহং-এর অস্তিত্ব আর নেই, তার প্রায় পুরো ক্ষমতা রয়েছে অন্যটির অহং-এর বিলোপ করার।

ঐ সমস্ত গুহ্য পদ্ধতির বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু চেতনার পক্ষে এটা প্রায় যুক্তিসিদ্ধ।

ওটাই হবে পদ্ধতি।

দেহে প্রাণের অনির্দিষ্টকালের জন্য দীর্ঘায়িত করার শর্তগুলি জানা আছে, বা প্রায় জানা আছে (ইন্দ্রিয়ানুভূত-এর চেয়েও বেশি — তারা পরিচিত), এবং কাজের মাধ্যমে তাদের শেখানো হয়েছে রূপান্তরের ভিতর দিয়ে যাওয়া দেহের শারীরিক ভারসাম্যের চরম ভঙ্গুরতা প্রতিহত করতে যে কাজ করতেই হবে। এটি প্রতিটি মিনিটের চর্চা, বলতে গেলে, প্রায় প্রতিটি সেকেন্ডের। অত্যন্ত কঠিন অংশ এটা। এটা কঠিন কারণ যার ব্যাখ্যা আমি ইতিমধ্যেই দিয়েছি সেই সমস্ত কারণের জন্য, কারণ ভারসাম্যহীন অবস্থায় থাকা নানান শক্তির অনধিকার প্রবেশ, এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদের নতুন ভারসাম্যের স্থিতিতে ফিরিয়ে আনতে হবে।

শ্রীমা: জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন, এপ্রিল ১৭, ১৯৬৫

একটা নতুন দেহে স্থানান্তরণ। যদি প্রয়োজন বোধ হয়, পদ্ধতিটা আবার ব্যবহার করা যেতে পারে। মূল ভাবনা এটা ছিল না, এটা সম্পূর্ণরূপে আপতিক — এটা ঘটতে পারে। এবং আমি যা বলেছি তা হল, এই কোষগুলির চেতনা থেকে অহং-বোধ বিনষ্ট হওয়ার পর (আমার মনে হয় তাদের থেকে এটা লোপ পেয়েছে, যদিও এই দেহটা তৈরি হয়েছিল অহং-বোধ ছাড়াই — যাই হোক না কেন, একটা নির্দিষ্ট সময়ে এর প্রয়োজন থেকে থাকলেও এখন এর আর প্রয়োজন নেই), অহং-বোধ বিনষ্ট হওয়ার পর, এ আরেকটি দেহে অভিব্যক্ত হতে সমস্যায় পড়ে না। বএবং এটা পুরোপুরি একটা প্রায়োগিক এবং জড়গত অভিজ্ঞতা, আমি বলতে চাইছি যে ঐ শরীর, এই শরীর, ঐ অন্য শরীর ব্যবহার করে এই চেতনার একাধিক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে … বিশেষকিছু জিনিসের জন্য; অবশ্য এটি ছিল ক্ষণিকের, একটা স্থায়ী উপায়ে নয়, কিন্তু ইচ্ছা মত, এবং সকল অবস্থাতেই যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী হয়ে থেকেছে, বাস্তবে এই অভিজ্ঞতাটা আমাকে দেওয়ার জন্যে।

শ্রীমা: জনৈক শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথন, এপ্রিল ২১, ১৯৬৫

শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য প্রণীত পুস্তকাবলী

অতিমানস চেতনার চিন্তা সঞ্চয়ন -
প্রকাশক ঃ শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ
(পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ) মূল্য ঃ ১৪০ টাকা

Sri Aurobindo and the advent of Supermind -
Publisher : Sri Aurobindo Society, U.K. (1st Edi.)
SAS, Ranchi (2nd Edi) Price : 125/-

श्रीअरबिन्द और अतिमानस का आगमन -
प्रकाशक : श्रीअरबिन्द सोसाइटि, रांचि, Price : 125/-

A Fragrant Flower of Cambridge - Sri Aurobindo and his Contribution to Humanity
Publisher : Sri Aurobindo Society, U.K. & Sri Aurobindo Society, Germany
(French, English & Hungarian Language) Price : 50/-
An outline of Sri Aurobindo's Epic Poem Savitri
Publisher : Sri Aurobindo Society, U.K.

শ্রীঅরবিন্দ - শ্রীমায়ের নির্ভীক সৈনিক গোপালদাকে যেমন দেখেছি —
ড. অরুন্ধতী রায়, মূল্য ঃ ৩০০ টাকা

কেমব্রিজের সুগন্ধযুক্ত পুষ্প - শ্রীঅরবিন্দ
(বাংলা, ওড়িয়া, তামিল, হিন্দী, কন্নড় ও অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত)
সাবিত্রীর রূপরেখা - প্রকাশক ডিগবয়, আসাম ও খুলনা (বাংলাদেশ)

An outline of Sri Aurobindo's Life Divine -
Publisher : Sri Aurobindo Society, U.K.

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন ও সাবিত্রীর রূপরেখা -
প্রকাশক ঃ পারুল পাবলিশার্স, আগরতলা, ত্রিপুরা
প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, ৮, শেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

Sri Aurobindo Society's Membership Subscription

Member (without Magazine)	One year	- ₹	30.00
Member with Magazine	One year	- ₹	180.00
	Three years	- ₹	520.00
	Five years	- ₹	860.00
Donor Member (10 years)		- ₹	4000.00
Institutional Member (One year)		- ₹	1500.00
Corporate Member (20 years)		- ₹	25000.00

অ.ভা.প.

(Date of Publication : 12th day of every month)
RNI No. : 24522/1973

The object of ***Auroservice*** is to bring together people who believe in and are ready to work for a new society according to the vision and teachings of ***Sri Aurobindo*** and ***The Mother***, more particularly in economic field.

The primary motive of ***Auroservice*** is not money-making but serving the community at large by providing quality goods and service at a reasonable price in the spirit of spiritual fraternity. In other words this will provide an opportunity to aspirants to take up work as Sadhana as an offering to the ***Supreme Lord***.

Auroservice Calcutta Centre at 8, Shakespeare Sarani, Kolkata-700 071, has been able to bring together people who are connected with the vast network of ***Sri Aurobindo Society*** providing quality products like ***Spices, Bottled Foods*** like ***Jam, Jelly, Pickles, Sauce, Ghee, Honey, Biscuits*** and ***Home-made Sweets etc.*** at reasonable prices. It is also marketing ***Incense Sticks, Ayurvedic Medicines, Perfumes, Natural Essential Oils, Pot Pourries, Herbal Cosmetics & Beauty Care Items etc.*** manufactured in the ***Ashram*** in ***Puducherry*** as well as by the different Centres and Branches of ***Sri Aurobindo Society***.

Auroservice, Calcutta Centre invites all the Branches and Centres of ***Sri Aurobindo Society*** and their members to participate in fulfilment of its objectives as buyers and suppliers of quality product.

Auroservice Calcutta Centre
Sri Aurobindo Society
SRI AUROBINDO BHAVAN
8. Shakespeare Sarani. Kolkata - 700 071
Phone : 033 2282 7790
e-mail : aurocal@auroservice.in, malayb@auroservice.in,
debasishb@auroservice.in